

সংবাদ প্রতিদিন
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০
রোববার
রংবাজি
সংবাদ প্রতিদিন এর সঙ্গে বিনামূল্যে



পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড ও স্ক্যান : নেট থেকে প্রাপ্ত

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com


www.anjali.bz

প্রতিদিন

রোববার

টিম রোববার

তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাঞ্জনা বসু, প্রসূন চক্রবর্তী,
বর্ণিনী মৈত্র চক্রবর্তী, বিপুল গুহ, ভাস্কর লেট, রিংকা চক্রবর্তী
রাজু সরদার, শান্তনু দে, সন্তোষ দত্ত, সুপ্রিয় দাস

সম্পাদক ঋতুপর্ণ ঘোষ
সহযোগী সম্পাদক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক
বি এল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

সংবাদ প্রতিদিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে।



দু'সপ্তাহ আগেই গেল পৃথিবী জুড়ে
মদনোৎসব— ভ্যালেন্টাইনস ডে।



ফার্স্ট পার্সন ঋতুপর্ণ ঘোষ

দু'সপ্তাহ আগেই গেল পৃথিবী জুড়ে মদনোৎসব— ভ্যালেন্টাইন'স ডে। আর তার পিছু ঘেঁষেই আমাদের ভারতজোড়া বসন্তোৎসব। মদনের উৎসব। বর্ণের উৎসব।

তাই এবার আমাদের সংখ্যা রং নিয়ে। রংবাজি। 'রং' কথাটা কেমন যেন মন ভাল করে দেওয়া কথা।

লাল, নীল, হলুদ, সবুজের আনন্দ যেন বর্ণহীন জীবনকে সুন্দর করার জন্যই সৃজিত।

একমাত্র কালো রং-ই অন্ধকারের রং। আর সাদা তার সমস্ত পবিত্রতা নিয়েও মাঝে-মাঝে শূন্যতার কথা মনে করায়।

তা ছাড়া, রং মানেই সাধারণত আনন্দ-অনুষঙ্গ। কিন্তু ছোট পানসিতে করে যে মানুষগুলো মাছ ধরতে যায় মাঝসমুদ্রে, আর দিগন্ত-জুড়ে যখন আকাশের রং গাঢ় থেকে গাঢ়তম হতে থাকে, বাতাসের জোরে টলমল করে পানসি—তখন কি সত্যিই চোখে পড়ে ওই গভীর আকাশের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে কত বেগুনি, গাঢ় নীল, গভীর ধূসরের শুরু?

কিংবা যখন গভীর রাতে ধড়মড় করে ঘুমভাঙা-চোখে জেগে ওঠে গ্রামসুদ্ধ লোক হঠাৎ লাগা আগুনের চাপে, তখন আঁধার আকাশের গায়ে জ্বলন্ত কমলা রঙের ফুলকির দিকে তাকিয়ে দেখে ক'জন! বা যখন, আমেরিকার নানা এয়ারপোর্টে দেখেছি, সিকিওরিটি-র আগে আলাদা করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে কতগুলো মানুষকে, যার মধ্যে হয়তো আমিও আছি—আর পরস্পরের গায়ের রঙের দিকে তাকিয়ে কিছুতেই দেখতে পাচ্ছি না কোনও কালিমার চিহ্ন—যেটা সহজেই চোখে পড়ছে আমেরিকার পুলিশদের।

নাঃ! রং নিয়ে বড্ড শক্ত-শক্ত কথা হয়ে যাচ্ছে। বন্ধুরা এসে যখন বলে,

—ফাটাফাটি একটা মেয়েকে দেখলাম। পার্ট-টার্ট দে না একটা। আলাপ করা যাবে।

তারপর তারা বর্ণনা করতে বসে। জিগ্যেস করি,

—কী পরেছিল রে?

কাঁচুমাচু মুখে বলে,

—কী জানি, শাড়ি নয়।

—ও! কী রঙের?

—দেখিনি তো!



পরিচয়, ভাল লাগা বইটির সঙ্গে

'সত্যি অর্থহীন এরকম প্রশ্ন : আপনি কি কোনও লেখা শুরু করার আগে ছোট-ছোট নোট লিখতে থাকেন? শুরুতেই লিখে ফেলেন শেষ পরিচ্ছেদটা? আপনি কলমে লেখেন? পেনসিলে লেখেন? টাইপরাইটারে লেখেন? লেখেন কম্পিউটারে?

একজনকে যদি ধীরে-ধীরে তৈরি করতে হয় একটা জগৎ, দিনের পর দিন; ক্ষণস্থায়ী কিছু কাঠামো নিয়ে ক্রমাগত নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়; যদি চরিত্রগুলোর কাজকর্ম চলতে থাকে সাধারণজ্ঞান-নির্ধারিত পথে, অথবা প্রথাগত কাহিনি বিন্যাসের অনুসারে অথবা তার বিরুদ্ধাচরণ করে; যদি বারবার আসে নতুন ভাবনা, বাতিল এবং পুনর্লিখনের বাধা ভাঙতে-ভাঙতে এগোতে হয় লেখাকে, তা হলে উপন্যাস লেখার কোনও নির্দিষ্ট রীতি থাকতে পারে না। অন্তত আমার জন্যে তো নেই। এরকম লেখক আছেন বলে আমি জানি যাঁরা সকাল আটটায় ঘুম থেকে উঠে সাড়ে আটটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত সমানে কি-বোর্ডের সামনে, লিখে চলেন, তাঁদের জীবনে এমন দিন নেই যেদিন এক লাইনও লেখেননি। এবং তারপর লেখা থামিয়ে বাইরে গিয়ে সন্ধে পর্যন্ত আমোদ করেন। আমি পারি না। প্রথমত আমি যখন উপন্যাস লিখি, তখন লেখার কাজটা শুরু হয় অনেক পরে। প্রথমে আমি লেখাপড়া করি। নোটস তৈরি করি। উপন্যাসের চরিত্রগুলোর ছবি এঁকে ফেলি। ছবিতে তাদের সাজপোশাক, শরীরভাষা ধরে রাখি, এইভাবে তাদের চিনতে-জানতে সুবিধে হয় আমার। উপন্যাসের ঘটনা যে-যে জায়গায় ঘটতে চলেছে তারও একটা ম্যাপ আঁকি। পর-পর যেভাবে ঘটনা ঘটবে সেই সময়-ছকটা সাজিয়ে নিই। এই কাজগুলো করি ফেল্ট-পেনের সাহায্যে। কম্পিউটারেও করি। নির্ভর করছে কখন কোথায় কোন সময়ে কাজটা করছি, তার ওপর। কিংবা কীরকম কাহিনি-ভাবনা বা অনুপুঙ্খ রেকর্ড করতে চাইছি, তার ওপর। ট্রেনের মধ্যে কিছু নতুন ভাবনা এসে গেলে ট্রেনের টিকিটের ওপরেও লিখে রাখি। নোটবুকে লিখি। ইনডেক্স কার্ডেও নোট করি, যখন যেরকম। বল পয়েন্ট পেন দিয়ে লিখি। টেপ রেকর্ডারে নোট করি। প্রয়োজনে ব্ল্যাক বেরির রস দিয়েও লিখেছি। তারপর আমি বর্জন করি, ছিঁড়ে ফেলি, ভুলে যাই কোথায় কী ছড়িয়ে আছে, কিন্তু আমার বাক্স ভর্তি-ভর্তি নোটবুক, তার মধ্যে নানা রঙে রাঙানো পাতার পর পাতা টুকরো-টুকরো কার্ড। আর এইসব অগোছালো লেখার তাগাড় আমাকে মনে করিয়ে দেয় কী আমি লিখতে চাই, কীভাবে কোন পথে এগোতে হবে।'

মনে হচ্ছে নিশ্চয়, কী খেয়ালি এই লেখক! যেন বড় অভাব যত্নের। অথচ উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রকে তিনি এঁকে ফেলছেন। ফুটিয়ে তুলছেন সেইসব ছবিতে তাদের অন্তরের ভাব। বলছেন, ওদের ছবি আমাকে আঁকতেই হয়। এইভাবে ওরা ক্রমশ শরীরে-মনে-পোশাকে ব্যবহারে স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমার সামনে। এই লেখকের কোনও তাড়া নেই উপন্যাস শেষ করার। বছরের পর বছর ধরে লেখেন একটি উপন্যাস। I do not understand those who write a novel a year; they might be wonderful and I do admire them, but I don't envy them. উপন্যাস লেখার আনন্দ তো 'লাইভ ম্যাচ' দেখার আনন্দ নয়। The beauty of writing a novel is not the beauty of the live match, it is the beauty of delayed transmission. কোনও উপন্যাস যখন ক্রমশ শেষের দিকে চলে আসতে থাকে, ইকোর খারাপ লাগে। The beauty, the real joy, is living for six, seven, eight years (ideally for ever) in a world that you are creating bit by bit, and which becomes your own. Sadness begins when the novel is over.

এইভাবেই লিখেছেন তিনি তাঁর 'দ্য নেম অফ দ্য রোজ', 'ফুকো'স পেন্ডুলাম', 'দি আইল্যান্ড অফ দ্য ডে বিফোর', 'দ্য মিস্টিরিয়াস ফ্লেম অফ কুইন লোনা'। এবং নিজের লেখার পদ্ধতি, রীতিনীতি নিয়ে অন্তরঙ্গ আলোচনা করেছেন উমবের্তো ইকো তাঁর 'অন লিটেরেচর' গ্রন্থে। বইটি প্রথম পড়ি বছর তিনেক আগে, যদিও বেরিয়েছে অন্তত সাত বছর হল। তাঁর উপন্যাসের অন্তর্জগৎ বদলে দিয়েছে আমার জীবনবীক্ষণ, আমার চেতনা। একই সঙ্গে কৃতজ্ঞবোধ করেছি তাঁর 'ট্র্যাভেল্স ইন হাইপার রিয়েলেটি' এবং সুন্দর ও কুৎসিত-কে নিয়ে দু'টি প্রগাঢ় গ্রন্থের কাছে। উমবের্তো ইকো-র সঙ্গে তুল্য কোনও লেখক বিশ্বসাহিত্যে এই মুহূর্তে যত দূর চোখ যায়, চোখে পড়ে না আমার। ইকো-মুগ্ধতা অচিকিৎস্য ব্যাধির মতো। কোনওভাবে মুক্তির উপায় নেই। বাধ্য হতে হয় অসহায় সমর্পণে। বোঝা-না-বোঝার আলো-আঁধারের মধ্যে ইকো আমাদের লোভ দেখান পথিক হতে এমন এক সরণির যার হদিশ শুধু তিনিই জানেন। ক্রমাগত উন্মোচিত হতে থাকে তাঁর প্রথাভাঙা ভাবনার, তাঁর প্রবুদ্ধ চেতনার প্রসারিত দিগন্তরেখা। আমরা ভেসে যাই তাঁর সঙ্গে এক অনিকেত দূরযাত্রার টানে : মধ্যযুগ সম্পর্কে সিনেমা বলেছে ক্রমাগত মিথ্যে কথা। সিনেমা আমাদের শিখিয়েছে সারিবদ্ধ আঁধার শতাব্দীর নাম মধ্যযুগ। মধ্যযুগের অন্ধকার বলতে সিনেমা কিন্তু বোঝাচ্ছে না যুক্তিহীন সংস্কার এবং ভাবনার অন্ধকার। মধ্যযুগের মন সিনেমার কাছে খুব জরুরি নয়। সিনেমা মধ্যযুগের যে-অন্ধকার ছবিতে ফুটিয়ে তোলে তা রাতের রং, চিন্তাক্লিষ্ট বিষণ্ণ ছায়া। এর থেকে মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। এ-কথা সত্যি যে মধ্যযুগের মানুষ বাস করত অন্ধকার অরণ্যে কিংবা রহস্যময় দুর্গের ছায়াচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠে, রাতের উপত্যকায় টিমটিমে আলোর শীর্ণ কক্ষে। মধ্যযুগের মানুষ রাতে ঘুমিয়েও পড়ত তাড়াতাড়ি। তারা বেশি অভ্যস্ত ছিল দিনে, রাতের থেকে (যে-রাত রোমান্টিকদের এত প্রিয়)। কিন্তু তা সত্ত্বেও মধ্যযুগ অন্ধকার নয়। মধ্যযুগের প্রতিনিধিত্ব করছে রঙের বিচিত্র ধ্বনি। মধ্যযুগ সুন্দরকে চিহ্নিত এবং ব্যাখ্যা করতে পেরেছিল আলো এবং বর্ণের নিরিখে। বুঝতে পেরেছিল সৌন্দর্যের আন্তর-সামঞ্জস্য। মধ্যযুগের

শিল্পকর্মে লাল-নীল-সোনালি-রুপোলি-সাদা-সবুজের সহজ ছন্দোবদ্ধতা। নেই কোনও জটিল মিশ্রণ। রঙের সামগ্রিক ছন্দোবদ্ধতা থেকে উৎসারিত মধ্যযুগের নিজস্ব শিল্পভাবনার দ্যুতি। বাইরে থেকে বিছিয়ে দেওয়া আলোর ঢাকনা কোনওভাবে নির্ধারিত করে না এই দ্যুতিকে। কিংবা রংকে চলকে যেতে দেয় না কোনওভাবে। মধ্যযুগের মিনিয়েচার পেন্টিংয়ে ভিতর থেকে বিচ্ছুরিত হয় আলো। মধ্যযুগের চোখে মার্বেল সুন্দর তার অন্দর থেকে সাদার বিচ্ছুরণে। 'এয়ার' (বাতাস) সুন্দর তার নামের মধ্যে সোনার আভাসের জন্য (because aer-aeris derives from the splendour of aurum, i.e. gold and that is why when air is struck by light, it seems to shine like gold)। মধ্যযুগের কান্তিদর্শনে চোখ সুন্দর যদি তার অন্তরে থাকে আলো। সেই আলো মধ্যযুগ সবচেয়ে বেশি দেখে সমুদ্রসবুজ চোখের তারায়, the most beautiful eyes are sea-green eyes. মধ্যযুগের স্নায়ু-আঁধারের মধ্যে যাতে প্রবিষ্ট হতে পারে আলো, তা-ই গথিক গির্জার জানলাগুলো চিরে দিচ্ছে আলোর ছুরি। এবং এই সব পার্শ্বজানলার সারি ক্রমাগত জায়গা বাড়াচ্ছে আলোর অলিন্দের। দেয়ালগুলো প্রায় উধাও আরোহমান খিলানের দীপ্ত খেলায়। মধ্যযুগের গির্জা যেন তৈরি হয়েছে বাজির মতো জ্বলন্ত কাঠামোর বিকিরণ পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে।

মধ্যযুগ থেকে ইকো সরে গিয়েছেন দান্তের কাব্য-প্রসঙ্গে। এবং সেই লেখায় অনিবার্যভাবে এসেছে মধ্যযুগের আলো-আঁধার প্রসঙ্গ তাঁর 'অন লিটেরেচর' গ্রন্থে। দেখা দিয়েছে দান্তে-ব্যাখ্যার নতুন আলো। ইকো পড়ার পর দান্তে, বিশেষ করে তাঁর 'পারাদিসো', আমার কাছে ফিরে এসেছে নতুন রঙে-রেখায়-স্বাদে। কিন্তু শুধু কি এইটুকু? ইকো কি ক্রমাগত বদলে দেন না আমাদের সাহিত্যচেতনা? ওলটপালট ঘটিয়ে দেন না আমাদের পরিপাটি সাহিত্যসংহিতার? তাঁর প্রগাঢ় প্রজ্ঞা, প্রসারিত বৈদগ্ধ্যের সামনে আমার অন্তত বড্ড অসহায় লাগে, যখন বুঝতে পারি পায়ের তলা থেকে ক্রমে সরে যাচ্ছে এতদিনের বিশ্বাস আর ধারণার জমি। ঈর্ষায় ভুগি। মনে হয় অসহনীয় ইকো-র মৌলিকতা :



মধ্যযুগীয় আলোক-আবেগের মূলে ছিল ধর্মীয় প্রভাব—সুদূর প্লেটোনিক এবং নিওপ্লেটোনিক উৎস থেকে উৎসারিত। সূর্য যেন শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক। আলোর সহজ সৌন্দর্য যেন সূর্য নামের এই বিশেষ আকারের দান, যে-আকার দমন করছে বস্তুর অন্ধকার। মধ্যযুগের চোখে ঈশ্বর যেন আলোর ফোয়ারা। মধ্যযুগেই দৃষ্টিবিজ্ঞানের জন্ম, in these centuries the study of optics develops, under Arab influence,—যে-বিজ্ঞান আমাদের ক্রমশ নিয়ে যাচ্ছে রামধনুর আশ্চর্যতায়, আয়নার অলৌকিত্বে। দান্তের ভাবনায় আরশি এক অলৌকিক রহস্যময় তরল পদার্থ, লিখছেন উমবের্তো ইকো 'পারাদিসো'-র দান্তে প্রসঙ্গে কথা বলতে-বলতে। খুলে দিচ্ছেন ভাবনার সেই সব জানলা যা বন্ধ ছিল বহু শতাব্দী।

'আ পোর্ট্রেট অফ দি আর্টিস্ট অ্যাজ ব্যাচিলার' প্রবন্ধে ইকো আলোচনা করছেন জেমস জয়েস-এর ভাষা নিয়ে। প্রথম থেকেই সম্পূর্ণ মৌলিক তাঁর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ : It is well known that Joyce became an enthusiast of Dante Alighieri and that he remained an enthusiast for the rest of his life...there are valid reasons for believing that he also had a certain familiarity with the Italian poet's ideas on the origin of language and with his plan for creating a perfect, new poetic language—যে কাব্য-ভাষা তৈরি করার কথা দান্তে লিখেছেন তাঁর 'অন ভার্নাকুলার এলোকোয়েন্স' (De Vugari Eloquentia)-এ। ইকো প্রথমে দেখাচ্ছেন কীভাবে মধ্যযুগের ভাষা-ভাবনার অনুপুঙ্খের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন দান্তে। তারপর একটি চমক-লাগানো প্রশ্ন তুলছেন : Did Joyce know of these early medieval grammarians? জয়েস কি খোঁজ খবর রাখতেন মধ্যযুগের এই ব্যাকরণবিদদের? পরিচিত ছিলেন তাঁদের ভাষামননের সঙ্গে? ইকো নিজেই উত্তর দিচ্ছেন এই প্রশ্নের : ১৯০১-এর ১১ অক্টোবর তরুণ জিম (জেমস জয়েস) গেলেন জন এফ. টেলর-এর লেকচার শুনতে। টেলর তাঁর ভাষণে আইরিশ ভাষার সম্পূর্ণ পরিণত রূপের প্রশংসা করে তুলনা করলেন 'ল্যাঙ্গুয়েজ অফ রিভিলেশন' বা চমকপ্রদ উদঘাটনের ভাষা হিব্রুর সঙ্গে—যে-ভাষাকে ব্যবহার করেছিলেন মোজেস। আইরিশকেও করে তুলতে হবে 'দি ল্যাঙ্গুয়েজ অফ রিভিলেশন', বললেন টেলর। এরপর ইকো লিখছেন, As we know, Taylor's idea was amply exploited in the 'Aeolus' chapter of Ulysses, which is dominated by the parallel between Hebrew and Irish, a comparison that represents a kind of linguistic counterpart to the parallel between Bloom and Stephen.

একদিকে হিব্রু আর আইরিশ। অন্যদিকে জয়েস-এর 'ইউলিসিস' উপন্যাসের দু'টি প্রধান চরিত্র—ব্লুম আর স্টিফেন। এই অব্যর্থ কাউন্টারপার্ট বা প্রতিরূপের প্রদীপ্ত ব্যাখ্যায় অতুলনীয় উমবের্তো ইকো। তিনি যে চোখে আঙুল দিয়ে কিছু প্রমাণ করছেন, এমন নয়। কিন্তু ক্রমাগত অ্যাকাডেমিক শৃঙ্খল অবলীলায় গুঁড়িয়ে দিয়ে বলে চলেছেন জয়েস-এর বিষয়-ভঙ্গি-বিন্যাস নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন কথা। এবং আমাদের শেষ পর্যন্ত ফিরে যেতে বাধ্য করছেন জয়েস-এর 'ইউলিসিস' এবং 'ফিনিগ্যান্‌স ওয়েক' উপন্যাসে। ইকো পড়ার পর জয়েস-এ ফিরে গেলে জয়েস-কে নতুন করে পাওয়া যাবেই। দান্তে-কেও।

এ দিন আজি কোন ঘরে গো

'ফুলোঁ কি রংগসে দিল কি কলমসে—'

এক যে ছিল মা, তার দু'টি মেয়ে। প্লাস একটি, মোট তিনটি মেয়ে, আর একটি সভাউজ্জ্বল বুক ভরানো জামাই। মেয়েরা খুব লক্ষ্মী, খুব আহ্লাদী, খুব কাজের, জামাইবাছারও গুণের শেষ নেই। আরও একটি হবু জামাই আছে, সেও সোনার চাঁদ, কিন্তু হবুদের তো হবার আগে লিস্টে ধরা যায় না? মা এদের সবার মা। মায়ের ঘরে সব আছে, হাসি আছে, খুশি আছে, ভালবাসা আছে, ফুলের গাছ আছে, পোষা প্রাণীরা আছে, একঘর আদরের মানুষজন আছে পরিবারে, তবু কী যেন একটা অভাব। কী যেন নেই? আসলে হয়েছে কী, সেই মায়ের মা হয়ে সাধ মেটেনি, এবারে সে প্রোমোশন চায়। সব থাকলে কী হবে, ঘরে তো কোনও নাতি নাতনি নেই! একটা খুদে সাইজের আহ্লাদী পেহ্লাদী নাতনি নিয়ে খেলা করার পেল্লায় সাধ হয়েছে মায়ের মনে। আস্তে আস্তে সেই মা-টা কেবল ভয় পাচ্ছে, আর অস্থির হচ্ছে। দিনকে দিন। সময় কেটে যাচ্ছে, চুলে পাক ধরছে, নাতনির আসার আর কত দেরি? এবারে যে বুড়োসুড়ো হয়ে যাবে সে, খেলা করার শক্তি কমে যাবে তার, গল্প বলার দম ফুরিয়ে যাবে। ভয় করলে কী হবে, নাতি নাতনিদের আর তার ঘরে আসার নাম নেই। এদিকে বন্ধুরা দিব্যি প্রোমোশন পেয়ে যাচ্ছে রোজ রোজ। বন্ধুরা একত্র হলেই আজকাল নাতি নাতনির গল্পে সাতকাহন। শুনতে শুনতে তারও ইচ্ছে করে, ঠিক অমন করে গল্প ফাঁদতে, 'আমার নাতনিটা না, সত্যি, এত বুদ্ধিমতী, কী বলব, বললে তুই বিশ্বাস করবি না—'

দোকানে বাচ্চাদের ছোট্ট ছোট্ট রঙ্গিন জামা সাজানো দেখলে মা বেচারির গলার কাছে কষ্ট হয়, বাচ্চাদের খেলনাপাতি দেখলেই তার কিনতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কিনে রাখবে কার জন্যে? সেটা তো আবার কুসংস্কারের নিষেধ!

মনের ইচ্ছেটা সে একদিন, সত্যি বলতে কী, একটু হিংসে হিংসে ভাব করেই বলে ফেলেছিল তার দিদ্মা ঠাম্মা হয়ে যাওয়া উচ্চপদস্থ বন্ধুদের কাছে। 'জানিস, আমারও খুব ইচ্ছে করে একটা নাতনি কোলে করে চটকাই, কিন্তু সেটা তো আমার হাতে নয়? হাতে থাকলে কি বসে থাকতুম রে, ধিনিক ধিনিক করে কবেই একটা নাতনি ঘটিয়ে ফেলতুম, দেখতিস!'

কে জানত 'ভালো-বাসা' বাড়ির আকাশ দিয়ে ঠিক তক্ষুনি 'তথাস্তু মুনি' ভেসে যাচ্ছিলেন? তথাস্তু মুনির কাজ শুধু 'তথাস্তু তথাস্তু' বলতে বলতে আকাশপথে ভেসে বেড়ানো। তাই আপনমনেও কোনও মন্দ ইচ্ছে প্রকাশ করতে নেই, ভুলেও উচ্চারণ করতে নেই কোনও অশুভ বাক্য। কিচ্ছু না বুঝেই যে তথাস্তু মুনি 'তথাস্তু' বলে দেন! তার ফল কখনও কখনও হয় অপরূপ সুন্দর, কখনও হয় বীভৎস। যেমন ধরো পরীক্ষার আগে কদাচ বিনয় অথবা ন্যাকাপনা করে 'আমি ঠিক ফেল করব' বলতে নেই, 'তথাস্তু মুনি'র 'তথাস্তু' উচ্চারণ যদি সেই মিনিটে হয়ে যায়, তা হলে আর রক্ষে নেই। তা হলে তুমি ফেল করবেই করবে। অতএব সর্বদা বলবে 'আমার দারুণ রেজাল্ট হবে'। তাতে দারুণ না হলেও, নিদারুণ হবার চান্স কম।

আমাদের ঘরের 'তথাস্তু মুনি'র মূল শিক্ষাটা বিলিতিয়ানায় এখন গৃহীত, লন্ডনে ট্যাক্সির গায়েও লেখা থাকে, 'থিংক পজিটিভ!'

তা, এই ক্ষেপী মা-টার দিদ্মা হবার গোপন ইচ্ছেটি কেমন করে কে জানে সন্ধের মিঠে বাতাস আপনিই বয়ে নিয়ে গিয়ে তথাস্তু মুনির কানে পৌঁছে দিল, আর ঠিক তক্ষুনি তিনি বললেন, 'তথাস্তু'!!

আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার?

তাই তো সকালবেলাতে চোখ মেলে দেখি চোখের পলকে ঘর দুয়ার আলো ঝলমল! অপরূপা এক নাতনি টুপ করে আকাশ থেকে খসে পড়েছে একেবারে আমার কোলের মধ্যে! 'মেরে ঘর আয়ি এক নান্হি পরি! এক নান্হি পরি!' তার ফোকলা মুখে একগাল চেনা মানুষের হাসি, গলায় পাখির ছানার মতো সরু মিঠে গান, হাতপায়ে কচি বেড়ালছানাদের মতো নরম তুলতুলে নাচ। বেড়ালছানা, কুকুরছানাদের সঙ্গে আমার মেয়েদের গলায় গলায় ভাব আজন্ম। মানুষের ছানাদের সঙ্গেও তাদের ভাব জমতে সময় লাগে না। আর এ তো সন্তান বলে কথা! কন্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়তে তার মা জননীর এক মুহূর্তও লাগল না, বাবাও নিমেষে বশীভূত। ছানাটি ছানা হলে কী হবে, ম্যাজিক জানে। মা-বাবাকে তো বটেই, এক মিনিটেই চিনে ফেললে, কে মাসুমণি, কে ছোটমাসি, আর হ্যাংলা মতন দিদ্মাটাই বা কোনজন। সবাই তো লাফাচ্ছে কিনা, সবাইকে মোটামুটি একইরকম উন্মাদ দেখাচ্ছে। তাদের সঙ্গে চেঁচাচ্ছে আর লাফাচ্ছে তিনটি সারমেয়, তুরতুরিয়া নীরাজনা দেবী, কৃষ্ণেন্দু কেল্টুস দেব, আর ভুতুমলাল ভুতোরিয়া দেব। আমরা প্রত্যেকেই যারপরনাই উত্তেজিত, কৃতার্থ, ধন্য। তার মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে নাম দিলেন, হিয়া। মাসুমণি বললেন, 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে, তোমার নাম পরী', দিদ্মা বললেন, 'ইচ্ছা হয়ে ছিলি বুকের মাঝারে!' আমাদের সদাশিব নাতনি একগাল হেসে, কুচি কুচি আঙুলে গুলি পাকিয়ে, দুই পা ছুড়ে জুলজুল চোখে তাকিয়ে, মধুঢালা গলায় বললে, 'গুগগুলু গগগল।' মানে, 'এই তো এসে গেলুম!'

এই বাড়ি চিরকালই আনন্দের। সুখ-দুঃখ যেটাই আসুক শেষ অবধি এই বাড়িতে দুঃখু বেশিদিন টিকতে পারে না, কিন্তু এত অফুরন্ত আহ্লাদ ইদানীংকার দিনে 'ভালো-বাসা' বাড়িতেও বিচ্ছুরিত হয়নি। উয়ো চান্দ খিলা, ইয়ে তারে হঁসে, ইয়ে রাত আজব মতওয়ালি হ্যায় সমঝনে ওয়ালে সমঝ গয়ে হ্যায়।

না সমঝে? না সমঝে উয়ো অনাড়ি হ্যায়!

'তথাস্তু মুনি'কে যে কীভাবে থ্যাঙ্ক ইউ দেব? জীবনের জমিন উর্বর হয়েছে, রং রসের বাঁধ ভেঙেছে। কেমন করে হল? ওই তো, তথাস্তু মুনির ইচ্ছাপূরণের ম্যাজিকে।

ঠাম্মা ঠাকুর্দা হইহই করে এসে পড়লেন তার বাবার ছেলেবেলার রুপোর বাসন আর গয়নাগাঁটির পুঁটলি নিয়ে, বউমার কোলে ঢেলে দিলেন নাতনির জন্যে। তাঁদের ঘরে দু'টি যমজ নাতি আছেন, নাতনি এই প্রথম। সমঝনেওয়ালেদেরই বলি, এবারে প্রশ্ন, নাতনির ভাল নাম কী হবে? হিয়ার দাদামশাইটিও প্রবল উত্তেজিত, খবর পেয়ে তিনি ব্যাংকক থেকে টেলিফোন করলেন, বিদেশে থাকলে কী হবে, কতকগুলো নতুন নতুন অভূতপূর্ব নাম বানিয়ে আনছেন। দাদামশাই-এর অবশ্য কপালটা চিরকালই ভাল, এখন তাঁর ছপ্পড় ফোড়কে নাতনি হচ্ছে। মাত্র গতমাসেই তিনি ঠাকুর্দা হয়েছেন, আর একমাসের মধ্যেই দাদামশাই। পুত্র কবীর আর বউমা রেবেকার মেয়েটির নাম হয়েছে এভা। এভা সেই নাতনির স্বর্গতা ঠাকুমার নাম। হিয়ার মা আর দিদ্মা যে নামের তালিকা দু'টি বানিয়েছেন, তাতে নতুন কোনও নাম নেই, সবই পুরনো কিন্তু পুরনো হয় না। দেখা গেল দু'টি নাম দু'জনেই ভেবেছেন, অপালা, আর অপরাজিতা। হিয়ার বাবা আর হিয়ার মাসিরা এক ডাকে অপরাজিতার পক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এক তো আমার নাতনি হিয়া সত্যি সত্যিই এক অপরাজিতা কন্যা। দ্বিতীয়ত, ওই নামে হিয়ার মায়ের দিদ্মা (কিংবা দিদ্মার মা) কবিতা লিখতেন। তা ছাড়া হিয়ার মা, মায়ের ঠাম্মা, ঠাকুর্দা, হিয়ার নিজের ঠাকুর্দা, দাদামশাই, কাকামণি, এ-বাড়ি ও-বাড়ি যেদিকে তাকাও, দেখবে নামের আদ্যাক্ষর 'অ'। শুধু হিয়ার ঠাকুমা আর বাবার বেলার শুরু 'প' দিয়ে (মায়ের ডাকনামটিও)। 'অপরাজিতা'তে সবাই সদলবলে উপস্থিত। এমনকী বাবার ডাকনাম 'অপু', আর দিদ্মার মা রাধারাণীর 'রা' পর্যন্ত। আর, হিয়ার মা নজর করিয়ে দিলেন, অপরাজিতার শেষে



'জিতা'টি নবনীতার সঙ্গে মেলে। হিয়ার মায়ের পিসিমণি বললেন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আশীর্বাদ করে দু'টো নাম দিয়েছিলেন, সুপুণ্যা আর সুপূর্না। তার মা দ্বিতীয়টা নিয়েছেন। অন্যটা সত্তরের বেশি বছর ধরে বাজারে ঘুরছে, কেউ নেয়নি, হিয়া নিতেই পারে। আমার এতদিনে খেয়াল হল, পিসিমণির নিজের মেয়ের নাম কেন সুপুণ্যা না দিয়ে শম্পাবল্লি দেওয়া হল, সেটা তো জানা হয়নি? জানতে হবে। দু'টো নাম একরকমের শুনতে বলে কি? গদগদ মাসুমণি বললেন, 'আরে, এ তো পরী'। আর ছোটমাসি আদর করে ডাকছেন 'গোল্লা, গোলটু'। দু'টোই একেবারে যথাযথ। আর রিয়ামাসি নাম রেখেছেন, পুঁটুরানি। দিম্মারও এটাই পছন্দ, তাঁর মতে আদর করার পক্ষে পুঁটুরানি 'সবচেয়ে বেস্ট' নাম। ওইটেই তিনিও গাপ করবেন ভাবছেন। ইতিমধ্যে দাদামশাই এসে পড়লেন হুটার বাজিয়ে, নামের তালিকা পকেটে নিয়ে। অত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি নাতনির জন্যে নতুন নতুন নাম বানিয়েছেন, সুযাচনা, বিহিতা, মুক্তিকা, নির্ণয়ী, আরও কয়েকটি নাম। ওই আইডিয়া অফ জাস্টিসের লাইনেই অদ্যাপি দাদুর ভাবনাচিন্তা খেলছে, নামগুলো দেখে যা বোঝা গেল। আমাদের গোটা মনুষ্যজীবনটাই তো জাস্টিসের গল্প। হয় থিয়োরিতে নয় প্র্যাকটিসে, আর দু'টোতে মিলন যদি হল তবে তো আদর্শ পৃথিবী। জনক-জননী আর সন্তানের বেলায় অবিশ্যি কোনও থিয়োরি খাটে না, সবটাই প্র্যাকটিস। আর সবটাই জাস্টিসের কোঠায়, ওপর থেকে নীচের দিকে বহতা ধারায় ইনজাস্টিসের তেমন জায়গা নেই। আজকাল নানাভাবে দেখতে পাই বিপরীত দিক থেকে উঠে আসছে অবোধ, অবিবেকী ইনজাস্টিস, এদেশের বৃদ্ধাশ্রমগুলি যার সাক্ষী। যা দেখি, যা শুনি, জানি না এই হিয়া পরী গোলটু পুঁটুরানী পুচকুন সুন্দরীদের পৃথিবীটা কেমন ধারা হবে? আমাদের ঠিক কোথায় রাশ টানা উচিত? হ্যাঁ রে দিদিভাই, বড় হলে তুই তোর বাবা মা দিম্মা দাদু ঠাম্মা ঠাকুর্দাদের চিনতে পারবি তো রে? এমনি করেই হাসবি, ভালবাসবি তো রে? ভুলে যাবি না? তাড়িয়ে দিবি না মন থেকে? বুক কাঁপে!

আপাতত 'ভালো-বাসা' বাড়ির রং-ঢং পালটে গিয়েছে। পুঁটুলি বেঁধে বেঁধে দিম্মার বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার বইপত্তর ফাইল-টাইল সব মাচায় তুলে হিয়ার ঘরের সব তাক খালি করে দেওয়া হয়েছে। কাঁথা থাকবে, জামা থাকবে, খেলনা থাকবে। চুলোয় যাক দিম্মার লেখাপড়ার টেবিল! ও তো মা-অবতারের বেলায় জরুরি জিনিস ছিল। দিম্মা-অবতারে ওসব দরকার নেই, দরকার দোলনায়। ঘর ফাঁকা না হলে পুচকুনের দোলনাটি বসাব কোথায়? যাতে শুয়ে শুয়ে সে নানারকম ইয়ার্কি ফাজলামি করবে আমাদের সঙ্গে? সে যে নিজেই বেজায় হাস্যকর জীব, তা তো সে জানে না? তাই সে আমাদের কাণ্ড কারখানা দেখে সারাদিন হাসে। তার মায়েরও অবিকল এই খিলখিল করে

সশব্দে হাসার অভ্যেস ছিল। আমার বাবা গেট দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে শুনতে পেতেন তিনতলাতে নাতনির হাসির শব্দ। হিয়া খিলখিলিয়ে হাসে, আর হাত-পা ছুড়ে হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করে। সে বোধহয় জানে এই হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করার মতো হাস্যকর আর কিছুই নেই, কিন্তু মানুষ জীবনভোর এইটেই করে চলে! সংসারের সারমেয়কুল মাঝে মাঝে তার দোলনার কাছে গিয়ে তাকে দূর থেকে কুর্নিশ জানিয়ে আসে। সে এতই ছোট, তার কোনও খেয়ালই নেই, কে যে কুকুর, কে পুতুল, কে চড়াইপাখি। সকলেই ওর কাছে বিভিন্ন মাপের নিরাপদ খেলার সাথী। কেবল নবাব সাহেবের সঙ্গে হিয়ার এখনও আলাপ করানো হয়নি, নবাব যে নিরাপদ নয়। সে তো ঘরের মধ্যে ঘোরে না, সে ঘোরে ছাদে, আর কার্নিশে কার্নিশে। মাঝে মাঝে তার জোরাল 'রক্ষা করো গো ও-ও-ও' হাঁক শুনতে পেয়ে, হিয়া কুতূহলী চোখ তুলে ওকে খোঁজে। এ বাড়ির তিনজন নির্ভীক কুকুরমশাই, রাস্তায় নিজেদের তিনগুণ সাইজের হিংস্র কুকুর দেখলেও যাঁরা দুর্দম বেগে ধেয়ে যান, তাঁরাই নবাবকে সাবধানে এড়িয়ে চলেন। কেননা যতবার ভাব করতে গিয়েছেন, প্রতিবার মাথায় নবাবের ঠোঁটের ঠোক্কর খেয়ে পালিয়ে এসেছেন তাঁরা। একটা পাখিকে তিনটে কুকুর যে এত ভয় পেতে পারে, চোখে না দেখলে কে বিশ্বাস করবে? জাঁহাবাজ মোরগ বটে!

হিয়া দিদি, তুই যাসনি যেন নবাবের ধারে কাছে। ওর আর তিন নম্বর বেগমে কাজ নেই। তুই খেলা করবি তোর তুরতুরিয়াদিদি, কেলটুস দাদা, আর ভুতুম ভাইয়ার সঙ্গে, আরও একটুখানি বড় হয়ে নে? হামা দিতে শিখে যা? তারপরে। ওরা ভাল, ওরা লক্ষ্মী, ওরা নরম, আদর করলে সবাইকে বিশ্বাস করে, আর তোর মতনই অকারণে ভালবাসতে জানে।

পুরো 'ভালো-বাসা' বাড়িসুদ্ধু সবাই হিয়াকে নিয়ে মেতে উঠেছি, বিনা কাজে মহাব্যস্ত হয়ে পড়েছি আমরা। বাবুসোনার সামনে মাধ্যমিক, সে বকুনি খাবে জেনেও হিয়াকে কোলে নেওয়ার সুযোগের জন্য ছোঁক ছোঁক করছে। শিবুমামা ক্ষণে ক্ষণে গলা খাঁকারি দিয়ে 'একটু আসছি?' বলে ঢুকে পড়ছেন, আর গাবলু কেবলই গড়িয়াহাটে ছুটছে আর নতুন এক একটা খেলনা নিয়ে ফিরে আসছে। মন যেন আর ভরে না কারুরই। নীলু আর ঝর্ণা তো হিয়ার সর্বক্ষণের খুঁটিনাটির সগৌরব পাহারাদার, কানাই আর গোপালও সারাদিন ছুতো করে চলে আসছে বাচ্চার কাছে। শুটিং-এর ফাঁকে ছোট্ট পরীকে দেখতে ছুটে ছুটে আসছেন তার পরীর মতোই মাসুমণিটি, নন্দনা। তাঁর আহ্লাদের শেষ নেই যে ঠিক এই সময়েই তার কলকাতাতে শুটিং পড়েছে। আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে দৌড়ে দৌড়ে অসময়ে বাড়ি এসে পড়ছেন গোলটুর ছোটমাসি, আর এক গোলটু, শ্রাবস্তী। হিয়ার বাবা আর মা, প্রতীক আর অন্তরা, মেয়ের কাজ ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। তাঁরা স্থির করেছেন, বাবা ইনপুট-এর দিকটা দেখবেন, অর্থাৎ কন্যার খাদ্য প্রস্তুত করবেন ও খাওয়াবেন। আর মা আউটপুটটা হ্যান্ডল করবেন, অর্থাৎ, ন্যাপি কাঁথা ইত্যাদি সাফসুতরো করবেন, মেয়েকে সাজাবেন আর স্নান করাবেন! এই স্নানের কাজটি করার খুব ইচ্ছে ছিল দিম্মারও, বেশ ছড়া বানিয়ে গাইতে গাইতে ননীর ডেলার মতন কচি কচি হাতে পায়ে জলপাই তেল মালিশ করে, রোদে পিঠ দিয়ে বসে কোলে করে স্নান করিয়ে দেব, মামণি যেমন দিতেন আমার মেয়েকে। কিন্তু ছানাটির মায়েরও যে সেই একই শখ? হবেই তো, ব্যাপারটা এখনও পুতুলখেলার মতো তো? বাচ্চাকে ঘুম পাড়ানো বাড়ির সকলেরই কাজ, কেননা ওইটে খুব সহজ। আড্ডা মারতে না দিলে, হিয়া আপনিই মিষ্টি মতো করে, পুতুলের মতো হয়ে, মুখে দু'টি আঙুল আলতো পুরে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তার মায়ের মতো পাড়া জাগিয়ে প্রবল যুদ্ধ ঘোষণা করে না নিদ্রাদেবীর বিরুদ্ধে। ওর মা কিছুতেই পছন্দ করত না ঘুমিয়ে পড়া ব্যাপারটা! তার চেতনা তার আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, এই অস্বস্তিকর অনুভূতিটাকে যে কোনও প্রকারে আটকাতে চাইত সে। এবং তাকে খাওয়ানোও ছিল আর এক যুদ্ধ। খেতে বললেই মুখ ঘুরিয়ে নেবে, আর পুৎ করে বের করে দেবে। বাকি সব সময়ে সে হাসিখুশি। খাওয়াতে আর শোওয়াতে না হলেই অন্তরা অতি চমৎকার শিশু।

হিয়ার দিম্মা তাঁর কচি নাতনিকে যত দেখছেন তত মুগ্ধ আর কৃতজ্ঞ হচ্ছেন। আহা, কী লক্ষ্মী কী লক্ষ্মী! দিম্মাদের তো কোনও নির্দিষ্ট দায় নেই, কর্তব্য নেই, নির্ঘণ্ট নেই, শুধু আড্ডা ফুর্তি খেলাধুলো হাসিখুশি ভালবাসাবাসি। মায়ের বেলাতে তো এমন স্বাধীনতা থাকে না। মায়ের তো দায় সবটাই। সে দায় কোনওদিনই কেটে যায় না, ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেলেও না। তারা চাক না চাক, এমনকী বিরক্ত হয় হোক, তবু মা স্বভাবদোষে সেধে দায় নেবেনই নেবেন, সেধে মতামত দেবেনই দেবেন (এবং ঝামেলাতেও পড়বেনই পড়বেন)! মায়েদের আর উচ্চশিক্ষা হয় না।

প্রোমোশনের পরের ধাপে কিন্তু এসব ঝক্কি নেই। ততদিনে এক খাবলা চুলের সঙ্গে এক খাবলা বুদ্ধিও পেকেছে, ঠাম্মা-দিম্মারা বুঝে যান, আসল কাজ শুধু একটাই। আদর করা। এ-দিম্মাও জানেন তাঁর কোনও প্রয়োজনীয়তা আসলে নেই। শুধু মা-বাবা রাতের দিকে বেরুলে তাঁর সোহাগের স্বেচ্ছা-ডিউটি নাতনিকে কাছে নিয়ে হয় লেখা, নয় ঘুমিয়ে থাকা। ব্যস। এরচেয়ে সুখের কাজ আর কী বা হতে পারে? কে ভেবেছিল এমন সুখ তথাস্তু মুনি আমাকে দেবেন? আহা হা, তেরে হি সপনে লে করকে সোয়া, তেরে হি ইয়াদোঁ মে জাগা—রাতে যখন শুতে যাই, হিয়ার হাসিমুখ চোখে ভাসে, আর সকালে ঘুম ভাঙলেই—কী করছেন তিনি এখন? যাই, একটু দেখে আসি।

দিম্মা হওয়া কি মুখের কথা? যশোধরা দিদিভাই এসে গাইলেন, 'এতদিন যে বসেছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুণে, দেখা পেলেম ফালগুনে।' এতটা শুনেই সে মেয়ে আহ্লাদে ফ্যাক করে হেসে দিল। না বাপু, তোমার সঙ্গে আমাদের অত মাখামাখি ভাল নয়। এখন থেকেই মনে মনে বিরহের জন্যে প্রস্তুতি চাই। একদিন তুমি তোমার মা-বাবার সঙ্গে দূরের শহরে নিজের বাড়িতে চলে যাবে। 'ভালো-বাসা' বাড়ি তখন তোমার বেড়াতে আসার ঠাঁই হবে। দিম্মাদের মনখারাপ করলে চলবে কেন? থোড়া থোড়া মিলনা থোড়িসি জুদাই সদা চাঁদনি রাত অচ্ছি নহি—তোর মাকে কোলে নিয়ে আমিও কি ভালো-বাসা বাড়ি থেকে চলে যাইনি অন্যদেশে, নিজের সংসারে, আমার মাকে রেখে?

'ভালো-বাসার বারান্দা'-র এখন আর এক রূপ খুলেছে। ছোট্ট ছোট্ট লাল নীল গোলাপি হলুদ জামারা সার বেঁধে ডানা মেলে প্রজাপতির মতো উড়ছে বাতাসে, সুন্দর সুন্দর কাঁথারা পতাকার মতো শুকোচ্ছে রোদ্দুরে, রান্নাঘরে বোতল ফোটানো হচ্ছে, চারিধারে রঙিন খেলনা ছড়ানো, আর জীবনের কেন্দ্রস্থল হয়েছে বইখাতা কম্পিউটার নয়, একটি দোল দোল দুলুনি দোলনা। স্বপ্নে ঠিক যেমনটি চেয়েছিলুম। এত্তটুকু দেড় ইঞ্চি পায়ে মল, এক ইঞ্চি হাতে বালা, দোলনায় শুয়ে ওড়িশি স্টাইলে হাত পা নাড়েন আমার সোনুমনু পুচকুন, একটুও কাঁদেন না, কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিলেও না, চোখ মেলেই আমাদের দিকে তাকিয়ে চমৎকার একটা ওয়েলকাম হাসি হেসে দেন। জেগে থাকলে তিনি কেবলই গুলতানি চান, স্পষ্টই তিনি তাঁর আড্ডাবাজ মা-দিম্মার লাইনেই যাচ্ছেন। বাবাটি ভদ্রলোক, বই হাতে করে একা থাকার টাইপ। তাঁর চুল মুঠো করে টেনে ধরে তাঁকেও আড্ডাবাজ বানানোর চেষ্টা চালাচ্ছে হিয়া। এইটুকুনি এক ক্ষুদে তৃতীয় প্রজন্মের দাপটে 'ভালো-বাসা' বাড়ি জমজমাট। আসলে তো ইনি চতুর্থ প্রজন্ম কিনা এই দিম্মার মায়ের বাড়িতে!

ইতনা মদির ইতনা মধুর তেরা মেরা প্যার/লেনা হোগা জনম হমেঁ কঈ কঈ বার!!

১৮.০২.২০১০

nabaneetadevsen@gmail.com

জীবন যখন সবুজ স্বাস্থ্যে ভরা

ক্লোরোফিল, ফড়িং, ডলার, তারুণ্য, বান্ধবীর টিপ

জীবনে প্রথম চুমু খেয়েছিলাম যে মেয়েটিকে, সেই বান্ধবী, সেই সরস্বতী পুজোর সন্ধেতে, সবুজ রঙের টিপ পরেছিল। বানালাম না, সত্যি। তখন বান্ধবীদের হাত ধরারও অনেক হ্যাপা ছিল। কিন্তু সেই বাসন্তী-সন্ধেতে একেবারে লক্ষ্যে স্থির ছিলাম যে সেদিনই চুমুটা খাব। বাড়ি পৌঁছে দিতে গিয়ে। কারণ সেই সন্ধেয় বাড়িতে নাকি কেউ থাকবে না। তার সেদিনের সেই টিপটায় প্রচুর জটিল কারিগরি ছিল। সবুজ রঙের টিপ, তার একধারে আটকানো একরত্তি একটা চিকচিকে সাদা পাথর। সেই টিপ কপালে বসানো ছিল ছোট্ট এক ফোঁটা শ্বেতচন্দনের ওপর। বান্ধবীর সেদিনের শাড়ির রংটাও সম্ভবত ওই চন্দন রং আর সবুজের কম্বিনেশনেই ছিল। সেটা আর মনে নেই। কিন্তু টিপটা মনে আছে। কারণ ওই টিপটা খুঁটিয়ে দেখার অছিলাতেই সেদিন মুখের কাছাকাছি মুখ নিয়ে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। আর দ্বিতীয়বার, খুলে আসা সেই টিপ ফের লাগিয়ে দেওয়ার অজুহাতে। তখন সবে আঠেরো। মনে হয়েছিল, সবুজ শুধু তারুণ্যের রং নয়, কামনারও রং সবুজ।

একটা সময়, মধ্যযুগে, পারস্যে, সুদানে কামনার রং সত্যিই ছিল সবুজ। কাব্যে, মানুষের একেবারে আদিম জৈবিক বাসনাগুলোকে বোঝাতে ব্যবহার করা হত সবুজ রং। নারীর, বিশেষত কৃষ্ণাঙ্গীদের যৌন আবেদনের রং ছিল সবুজ। 'সবুজ নারী', রূপকার্থে বলা হত তখন।

সবুজ, প্রকৃতির রং। মাটির নানা শেডের বাদামি বা পাথুরে ধূসরের বাইরে যে রংটা প্রকৃতিতে সব থেকে বেশি দেখা যায়, সেটা সবুজ। রোদে ঝলসে যাওয়া বাঁকুড়ার মাঠের তামাটে সবুজ থেকে তরাইয়ের যে-জঙ্গলে রোদ ঢুকতে ভয় পায়, তার গহিন সবুজ। হাজারো শেড। যদিও ছোটবেলায় ক্যামেলের রঙের বাক্সে থাকত শুধু দু'রকম সবুজ। 'লাইট গ্রিন' আর 'ডার্ক গ্রিন'। লাইট আর ডার্ক। যেন সাদা আর কালো। যেদিন হঠাৎই খুঁজে পাওয়া গেল যে নীল আর হলুদ মিশিয়েও সবুজ হয়, সেদিন কী ফুর্তি! সবুজ মানে তখন আত্মবিশ্বাস। সবুজ মানে, যে-রংটা আমি নিজেই তৈরি করতে পারি।

স্কুলের ওয়ার্ক এডুকেশন-এ ছিল 'ক্লে মডেলিং' আর 'পেপার ম্যাশে'। প্লাস্টার অফ প্যারিস-এর ছাঁচে প্রথমে জলে ভেজানো কাগজ, তারপর পরতে পরতে তুঁতের আঠা লাগানো কাগজের টুকরো বিছিয়ে মুখোশ তৈরির পর প্রথমে একটা পাতলা সাদা রঙের আস্তর দিতে হত। সেটা শুকোলে শুরু হত আসল রং চাপানো। রং বলতে কুমোরপাড়ায় যে জলে-মেশানো গুঁড়ো মেটে রং ব্যবহার হয়, সেই। তখনও একটাই সবুজ। কিন্তু ঘনত্বের তারতম্যে, আর নীচের সাদা রঙের সঙ্গে মিশে সেই সবুজের (এবং নীলের, এবং লালের) নানা রকমফের ঘটত। একদিন এক বিখ্যাত শিল্পী এসেছিলেন আমাদের সেই হাত পাকাবার আসরে। একটা মুখোশ টেনে নিয়ে জানতে চাইলেন, এটা কী রং? নির্ভাবনায় বলে দিলাম, 'সবুজ'। উনি জানতে চাইলেন কী সবুজ? এবার একটু সতর্ক হয়ে, 'লাইট গ্রিন'। উনি আরেকটা হাল্কা সবুজ রং দেখিয়ে বললেন, তা হলে এটা? কী মুশকিল, এটাও তো একটু অন্যরকম লাইট গ্রিন। উনি এবার খুব মন দিয়ে বোঝাতে শুরু করলেন। এটার রং-টা কেমন বলো তো? কড়াইশুঁটির খোসা ছাড়ালে দানার যে রংটা দেখা যায়, ঠিক সেরকম না? এটাকে বলে 'পি গ্রিন'। আর এই যে কালচে সবুজ রংটা, এটা 'মস গ্রিন'...।

একটা সময় পর্যন্ত সবুজ যদিও বেশ অপছন্দের রং হয়ে থেকেছে। যখন সুখাদ্য বলতে বড়দের বেঁধে-দেওয়া সংজ্ঞা ছিল 'গ্রিন ভেজিটেবল্স'। কিন্তু ঢের ভাল খেতে ফুটপাতের ঘুগনি, আলুকাবলি আর ফুচকা! কাজেই স্কুল থেকে ফিরে খেতে বসে, প্লেটের সবজি চোখের পলকে, মিসাইলের দ্রুততায় খোলা জানলা দিয়ে চলে যেত এদিক-সেদিক। কিন্তু এমনকী কাকরাও ঠোঁট ছোঁয়াত না সেই সবুজ সুখাদ্যে। সুতরাং ধরা পড়ে প্রবল ঠ্যাঙানি খাওয়ার অজস্র প্রমাণ ছড়িয়ে থাকত সর্বত্র। তখনও সাক্ষাৎ হয়নি 'মুর্গ হরিয়ালি কাবাব' বা 'হরা গোস্ত' জাতীয় মহাত্মাদের সঙ্গে। সেসময় একমাত্র সবুজ-প্রীতি ছিল চার আনায় তিনটে লেবু লজেন্স আর পাঁচ পয়সার আইসক্রিমে। দু'টোতেই জিভ গাল সবুজ হয়ে যেত বেশ কিছুক্ষণের জন্যে।

আর সবুজ ছিল পাঠ্য-বইয়ে, সবুজের অভিযান-এ। 'ওরে সবুজ, ওরে আমার কাঁচা' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন, অল্প কথায় বুঝিয়ে বলো। আরে কী আপদ, অল্প কথায় বুঝিয়ে বলবেন বলেই তো খোদ বিশ্বকবি অমন একটা কিশোর-পাঠ্য কবিতা লিখে দিয়েছেন। সেটাও আবার বুঝিয়ে বলতে হবে! পাঁচে দেবেন তো টেনেটুনে দেড়। তাতেই ছিল, 'পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা'। ব্যস, ফের বুঝিয়ে বলো কবি কী বলতে চেয়েছেন। স্যার, কবি মাথার ওপর



ল্যাজ তুলে নাচতে বলেছেন। বাংলার মাস্টারমশাই, যিনি চমৎকার পড়াতেন আর কখনও রাগতেন না, অত্যন্ত বিরক্ত গলায় বলেছিলেন—কে বলেছে, রবীন্দ্রনাথ তোর মতো হনুমানদের জন্য কবিতা লিখে গিয়েছেন! শুধু তারুণ্যের রং নয়, মূর্খামির রংও একসময় ছিল সবুজ!

অবশ্য মূর্খামির কি আর শেষ আছে! আরও পরে, যখন চেতনার রঙে শুধু চুনি নয়, পান্নাও বাড়াবাড়ি রকমের লাল হয়ে উঠেছে, তখনও সবুজ ছিল ঘোরতর অপছন্দের রং। সবুজ মানে তখন কলেজ ইলেকশনের শেষে সবুজ আবিরের রংবাজি। সবুজ মানে 'ছাত্ত পরিসঅঅঅদ... জিন্দাআআআ বাআআদ'। কেউ অপরাধ না নিলেই ভাল। এটা সেই সময় যখন পুরুষকণ্ঠের রবীন্দ্রসংগীতে দেবব্রত বিশ্বাসই শেষ কথা, বাকিরা ন্যাকা। যখন মোহনবাগানই একমাত্র ক্লাব এবং ইলিশমাছ মানুষে খায় না। ভাবা যায়, স্রেফ মোহনবাগানি বলে ইলিশ-বর্জিত জীবন! ভাগ্যিস 'ছাত্ত পরিসদ' বলে কখনও বন্ধুত্বে আটকায়নি। নয়তো প্রায় নির্বান্ধব থাকতে হত! এটা সেই সময় যখন সবুজ মানে পাকিস্তান। যে-দেশটা ক্রিকেটের মতো ভদ্রলোকের খেলায় নেহাতই অভদ্রের মতো ভারতীয় বোলারদের পিটিয়ে পাট করে, জেতা ম্যাচ হাত থেকে বার করে নিয়ে যায়।

ঈর্ষারও রং সবুজ। কারও শ্রীবৃদ্ধি দেখে প্রাণ কনকনিয়ে উঠলেই নাকি চুপিসাড়ে মনের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ে সবুজচোখো এক দৈত্য। কিন্তু সে সবুজ কী এক ধরনেরই সবুজ, না কি তারও নানা ধরনের শেড আছে? পাশের বাড়ির ধুমসো বাক্স-টিভি বদলে তন্বী শ্যামা এলসিডি টিভি এলে যে চোখ টাটায়, সেই সবুজ, আর আমি সারাজীবন চেষ্টা করেও কিছু করতে পারলাম না, আর ও কেমন ফোকটে নাম করে ফেলল, সেই বুক ফেটে-যাওয়া ঈর্ষার সবুজ রং কী এক? যার হাতে একটি চারাগাছও বাঁচেনি, সে যখন অন্যের শস্যসবুজ খেত দেখে কাতর হয়, তার ঈর্ষার রংও কি সবুজ? আসলে অন্য কোনও রঙের বেলায় অতটা নয়, কিন্তু সবুজ রঙের ক্ষেত্রে নানা পরস্পরবিরোধী ফ্যাচাং আছে। ইংরেজিতে যেমন বলে, অন্য দিকের ঘাসটাই সবসময় বেশি সবুজ। বেশ, বোঝা গেল। নদীর ওপারের সর্বসুখে খানিকটা ঈর্ষার রংও মিশেছে। কিন্তু যশোপ্রার্থীরা যখন ভাগ্য অন্বেষণে ঘর ছেড়ে বাইরে পা রাখেন, তখন তিনি নাকি আরও সবুজ তৃণভূমির সন্ধানে বেরোন। 'ফর গ্রিনার প্যাস্চারস'। তখন আর সবুজে কোনও দোষ নেই! যে-চাষির 'গ্রিন ফিঙ্গার্স', তার হাতে সোনা ফলে, আর যে বেচারা 'গ্রিন হর্ন', তার এখনও কিছুই শেখা হয়ে ওঠেনি। সে অনভিজ্ঞ। সবুজ আঙুল হয় না, সবুজ শিং-ও নয়। খামোকা সবুজ রংটাকে চারিত্রিক সংকটে ফেলে দেওয়া।

রোগক্লিষ্ট মুখও নাকি পাণ্ডুর সবুজ হয়ে যায়। অসুস্থ হওয়া মানে 'লুকিং গ্রিন অ্যারাউন্ড দ্য গিল্স'।



মা-মাছেরা বোধহয় পোনাদের বলে, 'আয় তো দেখি, জ্বর হল কি না। কানকোর কাছটা কেমন সবজেটে লাগছে।' এমনকী মৃত্যুরও রয়েছে সবুজ আভা। নরকে সবুজ আগুন জ্বলে। মধ্যযুগীয় কেতাবে-ছবিতে শয়তানের গায়ের রং প্রায়শই সবুজ। যেমন কমিক স্ট্রিপ-এ ভিলেনদের পোশাক। স্পাইডারম্যানের অন্তত আধ ডজন চিরশত্রুর পোশাক সবুজ। অথবা ব্যাঙ্কের গোবেচারা কেরানি স্ট্যানলি ইপকিস ভুতুড়ে মুখোশ পরে যখন মাস্ক হয়ে যান, তাঁর মুখের রং আর কিচ্ছু নয়, সবুজ। বেলা লুগোসি যখন ব্রডওয়েতে কাউন্ট ড্রাকুলা সাজতেন, তখন তাঁর মেক আপ-এও ভয়-দেখানো সবুজের ছোঁয়া। প্রাণ কোথায়, প্রাণহীনতার রং সবুজ।

অথচ 'গ্রিন' শব্দটাই এসেছে প্রাচীন ইংরেজি ক্রিয়াপদ 'গ্রোয়ান' থেকে, যার অর্থ বৃদ্ধি। কাজেই সবুজ মানে ফলন, সবুজ মানে জীবন অনেক বেশি সতেজ স্বাস্থ্যে ভরা। কিন্তু কেউ বলেন না, আহা গাল দু'টো কী টসটসে সবুজ। স্বাস্থ্য যেন ফেটে পড়ছে! খোদ ব্রিটিশরাই সবুজ নিয়ে রীতিমতো বাতিকগ্রস্ত। এ নাকি ব্রিটিশ ভূখণ্ডে কেলটিক অপসংস্কৃতির ছেড়ে যাওয়া চটিজুতো। কেলটিক সংস্কারে সবুজ রং দুর্ভাগ্য আর মৃত্যুর দ্যোতক। সবুজ আর সোনালি মানে ক্ষয়িষ্ণু যৌবনের প্রতীক। এখনও ইংল্যান্ডে পারতপক্ষে কেউ সবুজ জামাকাপড় পরতে চান না। সবুজ রঙের গাড়িরও নাকি চাহিদা নেই।

অথচ ইংল্যান্ডের পড়শি আয়ারল্যান্ড-এ সরকারি রং সবুজ। আয়ারল্যান্ডের চিরহরিৎ তৃণভূমির প্রতীক। আয়ারল্যান্ডের জাতীয় পতাকাতেও সমাদরে সবুজ। যেমন আফ্রিকার একাধিক দেশের পতাকায়। লাল-কালো বা লাল-সোনালির পাশে সবুজ রং সেখানে বিরাট এক সবুজ মহাদেশের অভিজ্ঞান তো অবশ্যই, আফ্রিকান জাতিসত্তারও উচ্চকিত ঘোষণা। আফ্রিকার সব থেকে পুরনো স্বাধীন দেশ ইথিওপিয়া-র পতাকা থেকে ধার করে সবুজ রং তাই দক্ষিণ আফ্রিকা, ঘানা, সেনেগাল, জিম্বাবোয়ের জাতীয় পতাকায়। আর আফ্রিকার বাইরেও, সবুজ মানে কালো মানুষদের কাছে উৎপাদন, প্রজনন, বৃদ্ধি, বিস্তার। সবুজ মানে সম্ভাবনার পুনর্জন্ম। প্রকৃতির সঙ্গে তাদের আজন্ম সখ্য, তাদের নিত্যদিনের রোমান্সের রং-ও সবুজ। ব্রাজিল বা জামাইকার পতাকাতেও তাই সবুজের সালসা। ভারতের তেরঙায় সবুজ মানে উর্বরতা, উন্নয়ন। আর ঝাড়খণ্ডিদের পতাকায় অরণ্যের অধিকার।

তবে সবুজ রং সম্পূর্ণ অন্যতর এক ধর্মীয় অনুষঙ্গ নিয়ে স্বমহিমায় ইসলামি দেশগুলোতে। সবুজ ইসলামের রং। পবিত্র রং। হজরত মহম্মদের প্রিয় রং। বলা হয়, ইসলাম ধর্মের সূচনা যেহেতু উষর মরুভূমিতে, যেখানে কোথাও ছিটে-ফোঁটা সবুজও নেই, সেখানে সবুজ মানে চোখের আরাম, প্রাণের আনন্দ, উচ্ছ্বাসের উপলক্ষ। বিশ্বাসীরা জানেন, বেহেস্তেও প্রচুর সবুজ গাছপালা, লতাগুল্ম। অনেক ইসলামি দেশের পতাকার রং তাই সবুজ। ঘরের কাছে পাকিস্তান, বাংলাদেশের পতাকার সবুজ জমি। ইরানের পতাকাতে একফালি সবুজ। লিবিয়া তো পুরোটাই সবুজ, একমাত্র দেশ যাদের পতাকায় অন্য কোনও প্রতীক বা নকশা নেই, স্রেফ একটাই রং। প্যালেস্তাইনের জঙ্গিগোষ্ঠী 'হামাস'-এর পতাকাও সবুজ রঙের।

আর বিংশ শতাব্দীতে, পরিবেশ সুরক্ষার রং হয়েছে সবুজ। পরিবেশ সচেতন জীবনযাত্রার রং, এমনকী পরিবেশবাদী রাজনীতির রংও এখন সবুজ। শুরু হয়েছিল জার্মানিতে, সত্তরের দশকে। 'ডি গ্র্যুনেন'। সবুজ দল। এখনও মনে আছে ফ্রাঙ্কফুর্ট অটো ফেয়ার-এ এক গাড়ি-কোম্পানির কর্তার সেই বিরক্ত মুখ। বাইরে তখন সূর্যমুখী ফুল হাতে গ্রিন পার্টি-র বিক্ষোভ চলছে। ভদ্রলোক নিমপাতা খাওয়া মুখে বললেন, 'এরা বদ্ধ উন্মাদ। গাড়ির ধোঁয়ায় দূষণ হয় বলে লোককে বলছে গাড়ি কিনো না!' কিন্তু ঘটনা হল, এই উন্মাদরা ছিল বলেই গাড়ি কোম্পানিগুলো বহু লক্ষ ডলার খরচ করে তাদের ইঞ্জিনগুলো পরিবেশ-বান্ধব করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এদের পাগলামির জন্যেই বিয়ারের ক্যান থেকে সুপার মার্কেটের প্লাস্টিকের প্যাকেট, সব কিছুর ওপর সবুজ ছাড়পত্র বাধ্যতামূলক। 'গ্রিন মার্ক'। যে সবুজ ফোঁটার অর্থ 'রিসাইকেলেব্‌ল'। পুনর্ব্যবহারযোগ্য। এদের জন্যেই খাদ্যশস্যে, সবজিতে, ফলমূলে কীটনাশকের যথেচ্ছাচার নিয়ে লোকে আজ সতর্ক। এরা আছে বলেই বেঘোরে মারা যাচ্ছে না সিলের ছানা, নীল তিমি। এখন একশোরও বেশি দেশে চলছে এই সবুজের অভিযান। আধমরাদের ঘা মেরে বাঁচাতে তারা ব্যস্ত।

আরেক কিসিমের কাগুজে সবুজ, সে মহাশক্তিমান। অনেক বন্ধ দরজার সবখোল চাবি সে। সরকারি সনদেও যে কাজ হয় না, চুটকি বাজিয়ে সে-কাজ করে ফেলতে পারে এই এক টুকরো কাগজ। হিন্দিভাষীরা বলে 'হরা পাত্তি'। জাতির জনকের সহাস্য প্রশ্রয় রয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরের সই করা সেই সবুজ কাগজে। অবশ্য তার থেকেও ক্ষমতাবান হরা পাত্তি আছে এ ধরাধামে। রাতকে দিন করতে পারে সে। ইরাককে বানাতে পারে গুয়ান্তানামো বে। বুশকে প্রেসিডেন্ট। মহামান্য মার্কিন ডলার। বিখ্যাত 'গ্রিন ব্যাক'। ক্যাপিটালিজমের রং নাকি সবুজ, বলত দাদারা।

সব শেষে সবুজের প্রতি আরেক দফা কৃতজ্ঞতা স্বীকার। ট্রাফিকের আলো সবুজ। আঙুর সবুজ। আঙুর থেকে যদি হোয়াইট ওয়াইন তৈরি হয়, তা হলে তার বোতলের কাচ ট্র্যাডিশনালি সবুজ। গঙ্গাফড়িং সবুজ। গাছের পাতা সবুজ, সৌজন্যে ক্লোরোফিল। পান্না সবুজ, সৌজন্যে ক্রোমিয়াম। আর মোহনবাগান মাঠের ঘাস সবথেকে সবুজ, সৌজন্যে টুটু বসু। সিনেমার সব থেকে সস্তা টিকিটের রং, মাল্টিপ্লেক্স নয়, সাবেকি সিনেমা হলের ফ্রন্ট স্টলের টিকিটের রং—সবুজ। আর সবুজ ছোটবেলাটা। কখনও খুব মন কেমন করলে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার পেছনে তাকালেই হল। একেবারে চোখ জুড়নো সবুজ। শান্তি।

লাল দরজা লাল অলিন্দ

রক্ত, পাপ, সতর্কীকরণ, মঙ্গলগ্রহ, আপেল

I'm so fortunate to be red! I'm firey. I'm strong. I knew men take notice of me and that I cannot be resisted.

MY NAME IS RED
ORHAN PAMUK

এক

লাল হল গিয়ে মাস্তানির রং; ভিস্যুয়াল ঈশ্বর। 'রণে বনে ইউনিয়নে' লাল রং-ই সম্রাট। লাল ডাকাবুকো, ক্ষমতার রং। প্রাচীন রোম-এর যুদ্ধের দেবতা মঙ্গলগ্রহের রং লাল। রাজারা যুদ্ধবাজ, তাই লাল রাজকীয়। আগ্রাসন আর আধিপত্যের প্রতীক। সে-যুগে টাইরিয়ান পার্পল নামের একটি রঞ্জক, যা দিয়ে লাল রং করা হত, তা ছিল অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। অতএব দুর্মূল্য, তাই রাজসিক। তাই অতি বিশিষ্ট অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতে 'রেড কার্পেট' প্রথা। লাল প্ররোচনার রং। দুরন্ত ষাঁড়ের চোখের সামনে লাল কাপড় দুলিয়েই তাকে খেলিয়ে দেয় মাতাদোর। লাল রক্তের রং। মানুষের জীবনরস। তাই যুদ্ধ-হত্যা-পাপের অনুষঙ্গে লাল রং, আবার লাল শহিদত্ব বরণের রং, সে ধর্মযুদ্ধেই হোক কিংবা শ্রেণি-যুদ্ধে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের রক্তপতাকা, 'শত শহীদের রক্তে রাঙানো' বিপ্লবের ঝান্ডা আর কমরেডশিপ মানে রক্তের বেরাদরি। মেহনতি মানুষের লড়াই আর রাজকীয় সম্মানের বড়াই দু'টোরই প্রতীক লাল রং। লাল ঝান্ডা থেকে লালবাতিওলা পাইলট কার।

লাল পাপের রং। আদিমাতা হবা স্বর্গের বাগানে যে-ফল নিজে খেয়েছিলেন এবং আদমকে খেতে প্ররোচিত করেছিলেন, তা হল একটি আপেল। আর পাপ বলতে, প্রথম ভাইয়ের রক্ত যখন ভাইয়ের হাতে লাগল। শয়তানের পোশাক লাল, সাতটি মারাত্মক পাপের অন্যতম 'রথ' (প্রতিশোধপ্রবণ ক্রোধ)-এর বর্ণ লাল। হাতেনাতে ধরা পড়লে বলা হয়, কট রেড হ্যান্ডেড। আগুনের লেলিহান শিখার রং লাল। আগুন, যা পুড়িয়ে শুদ্ধ করে তোলে, যা বাঁচায় হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে। তাই লাল রং পবিত্র এবং রক্ষা-কবচ, যা বাঁচায় কুদৃষ্টি, রোগবালাই, অশুভ শক্তির হাত থেকে। ওই যে রোদে শুকোতে দেওয়া বড়ির ওপর লাল লঙ্কা, মালাই বরফের হাঁড়ি কিংবা পাঁশকুড়ার চপের ঝুড়িতে লাল কাপড় জড়ানো তার কারণ কিন্তু ওই কুদৃষ্টি কাটানো। লেপের খোল লাল রঙের হওয়াই দস্তুর। রোগবালাই দূরে থাকবে।

লাল ভালবাসার রং, ভ্যালেন্টাইন'স ডে-র অফিসিয়াল কালার। সারা বিশ্বের প্রেমের প্রতীক লাল গোলাপ। আর প্রেম এলে তার যমজ বোন কি দূরে থাকতে পারে? তাই লাল কামনারও প্রতীক। লাল গোলাপ, লাল আপেল, লাল ঠোঁট, লাল চেরি, লাল মদিরা, লাল চোলি, লাল দুপাট্টা মলমল কা। তাই বিয়েতে লাল বেনারসি, সিন্দুর-কুঙ্কুম-অলক্তচরণ লালে লাল। সমাজসিদ্ধ, আইনসিদ্ধ প্রেম-বিবাহ-কামনা থেকে নিষিদ্ধ লালসার জগতেও তিনি হাজির। তাই ও-পাড়াকে বলা হয় 'রেড লাইট এরিয়া'।

সত্যি বলতে কী, এমন 'আমিই কচ, আমিই দেবযানী' মার্কা রং এই একটিই আছে। একই সঙ্গে পাপ ও পবিত্রতাকে ধারণ করে, যুদ্ধ ও প্রেমকে ধারণ করে। গুপ্তহত্যা আর 'রেড ক্রস'-এর সেবাপরায়ণতার প্রতীক হয়ে পোপেও আছি, পাপেও আছি অবস্থা! রঙের দুনিয়ায় মনুষ্যচক্ষু-গোচর সবচেয়ে বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট (এর চেয়ে বেশি হলে ইনফ্রা-রেড) এই মৌলিক রংটি সারা দুনিয়ায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের চোখ টানে। তাই এ হল সতর্কীকরণের চিহ্ন। বিপদ বোঝাতে রেড সিগন্যাল। জরুরি অবস্থা বোঝাতেও তাই। লাল বাতির নিষেধ দেখলে নিমেষে দাঁড়িয়ে যায় বাঘা-বাঘা ভল্‌ভো। দাহ্যবস্তু বোঝাতে লাল রং ব্যবহার করা হয়, আবার আগুন নেভানোর সরঞ্জাম থেকে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ির রং পর্যন্ত সব লাল। রগচটা খেলোয়াড়কে শায়েস্তা করতে দেখানো হয় 'লাল কার্ড'। আর চট করে চোখে পড়ে বলে বিজ্ঞাপন-জগতেও লাল রং বহুল ব্যবহৃত, নিত্য সেখানে স্লোগান ওঠে, 'গিভ মি রেড'। খাবারের প্যাকেটে আমিষ বোঝাতে থাকে লাল বৃত্ত। পরিবার পরিকল্পনায় লাল ত্রিকোণ।

দুই

ফাগুন-চৈত্র এলেই খুবসে নিমপাতা-সজনেফুল খেতে হত সোনামুখ করে, আর দোলে আবির-মাখা কম্পালসরি। ওগুলো অ্যান্টি-পক্স (রক্ষাকবচ কেস)। তখনও, ন্যাড়া পক্স বললে যে সাহেবরা সিফিলিস বোঝে, সে-সব জানতে ঢের দেরি। যাই হোক, এছাড়াও ছিল পক্স না-হওয়ার জন্য হোমিওপ্যাথির পুরিয়া। বসন্তকালে সেইসব পুরিয়া মা কপালে ঠেকিয়ে নমো করে আমাদের খাওয়াত, আমাকে আর দাদাকে। যাতে পক্স আমাদের ওপর পক্ষপাতিত্ব না করে। রং খেলাতেও কখনও কসুর করিনি। লাল আবির তো মেখেইছি, বাঁদুরে রং মেখে চেহারা লোডশেডিং বানিয়ে ফেলেছি। তবু একবার 'এমনো বসন্তদিনে' পেটে একটা ফুসকুড়ি হল। সে ফুসকুড়ি



সারানোর জন্য গঙ্গামৃত্তিকা লাগানো হল, তবু সকালের ফুসকুড়ি সন্ধ্যার মধ্যে গিয়ে সারা গায়ে জলবসন্তর গুটি। দাদার বেরল পরদিন। দু-ভাই মিলে দিবারাত্র সুতির মশারির ভিতরে দু'বেলা লুচিটুচি খেয়ে কাটালাম দু-হপ্তা। 'মায়ের দয়া' হয়েছে বলে সন্ধেবেলা ধুপধুনোও দেওয়া হত আমাদের ঘরে। খোসা-ওঠার সময় হলে খালি দেশলাই বাক্স নিয়ে চলত আমাদের ট্রফি কালেকশন। তবু প্রতি বসন্তকালে দোলের সময় অনিচ্ছুককে আবির মাখাতে মাখাতে, প্যাকেটসুদ্ধু মাথায় উজাড় করে দিতে দিতে কেউ না কেউ বলে উঠতই : মাখতে হয়, অ্যান্টি-পক্স।

তখন একটু সেয়ানা হয়েছি, পাখি-পতঙ্গ দেখতে শিখেছি। পত্রিকায় স্যানিটারি ন্যাপকিন-এর বিজ্ঞাপন দেখে খুব কৌতুহল। 'মেন্স' কাকে বলে? কেন 'উইমেন্স' বলে না? এইসব। পূর্ণামাসি তখন সবে বিএসসি পাশ করেছেন কি নার্সিং ট্রেনিং-এ ঢুকেছেন। আমাদের বয়সোচিত কৌতূহলের কথা কী করে যেন পূর্ণামাসির কানে পৌঁছতেই ঘাড় ধরে সব ক'টা চ্যাংড়াকে বসিয়ে স্লেট পেনসিলে ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিলেন কাকে বলে ফ্যালোপিয়ান টিবিউল, কাকে বলে ওভ্যুলেশন আর কাকে বলে 'সাইলেন্ট ক্রাই অব উম্ব'। ওরে বাবা, এ তো পুরো জীবনবিজ্ঞানের ক্লাস : তাই আমরাও কৌতূহল হারালাম।

আমাদের কবিগুরু নাকি বর্ণান্ধ ছিলেন। লাল রংকে দেখতেন স্নিগ্ধ সবুজ। ভাবি, এত ফুল থাকতে নন্দিনী যে রক্তকরবী বেছে নিয়েছিল, সে কি রজনীগন্ধা ভেবে?

তিন

ভ্যালেন্টাইন বলে একটা মেয়ে ছিল, পার্ট টাইম মডেল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, তার প্রেমিক দূরে থাকত আর খালি সন্দেহ করে ধমকে-ধমকে ফোন করত। ঘটনাচক্রে ভ্যালেন্টাইন-এর সঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত এক বৃদ্ধ বিচারক জোসেফ কার্ন-এর আলাপ হয়। জোসেফ-এর কুকুর রিটা ভ্যালেন্টাইন-এর গাড়িতে চাপা পড়ে। আহত এবং গর্ভবতী রিটাকে চিকিৎসার সুবাদে জোসেফ ও ভ্যালেন্টাইন-এর একটা অদ্ভুত সম্পর্ক তৈরি হয়। আশ্চর্য লোক এই বৃদ্ধ বিচারকটি। আড়ি পেতে প্রতিবেশীদের ফোনের কথাবার্তা শোনে সে। এই ফোন-এর মাধ্যমেই, অনিচ্ছাসত্ত্বেও কারিন আর অগুস্তের প্রেমের কথা জানতে পারে ভ্যালেন্টাইন। অগুস্তে একজন হবু বিচারক, পরীক্ষার দিন যার হাত থেকে পড়ে গিয়ে বইয়ের যে পৃষ্ঠাটা খুলে যায় ঠিক সেটা থেকেই প্রশ্ন আসে। বিচারকের পরীক্ষায় পাশ করলে কারিন অগুস্তেকে একটা ঝরনাকলম উপহার দেয়। যদিও জোসেফ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে ওই প্রেম টিকবে না। টেকেও না। কারিন অন্য পুরুষসঙ্গী পাকড়ায়। ঠিক এইরকমই ঘটেছিল জোসেফ-এর জীবনে। কারিন-এর মতো একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম ছিল তার। তারও হাত থেকে বই পড়ে যে-পৃষ্ঠাটা খোলে সেটা থেকেই পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে। কারিন-এর মতো সেই মেয়েটাও জোসেফকে দাগা দেয়। এবং ভাগ্যের এমন পরিহাস যে জোসেফ-এর এজলাসে এমন একটা মামলা আসে যাতে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সেই লোক, যে নাকি জোসেফ-এর প্রেমিকাকে ভাগিয়ে নিয়েছে।

ক্রিস্তফ কিসলোস্কি-র বিখ্যাত ট্রিলজি-র অন্যতম 'থ্রি কালারস : রেড'-এর ঘটনা এগোয় ভ্যালেন্টাইন আর জোসেফ-এর অদ্ভুত সম্পর্ক ঘিরে। লাল এখানে মৈত্রী আর সৌভ্রাতৃত্বের কথা বলে। 'থ্রি কালারস : রেড'-কে বলা হয় অ্যান্টি-রোমান্স, যেখানে প্রত্যাশিত প্রায় কিছুই ঘটে না। শুধু রিটা সাতটি কুকুরছানার জন্ম দেয়। ঝকঝকে আবহাওয়ার মাঝে বেমক্কা ঝড় উঠে ফেরি ডুবে অধিকাংশ চরিত্র মারা যায়। জোসেফ নিজে থেকে পুলিশের কাছে আড়ি পাতার দোষ কবুল করে। ছবির শেষে পর্দা জুড়ে বিশাল হোর্ডিং-এ লাল পটভূমিকায় ভ্যালেন্টাইন-এর মুখ, সেই লাল রং, যা গোটা সিনেমা জুড়ে প্রায় প্রতিটি ফ্রেমে—কোনও না কোনও কিছুতে, গাড়ি-টেলিফোন-দেওয়াল-সাইন বোর্ডে, উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত।

যে-উদ্ধৃতি দিয়ে লেখাটা শুরু হয়েছে সেটা ওরহান পামুক-এর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস 'মাই নেম ইজ রেড'-এর একত্রিশ নম্বর অধ্যায় 'আই অ্যাম রেড' থেকে নেওয়া। ওই অধ্যায়েরই আরও কিছুটা অংশ বাংলা করে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না :

দুর্গের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া সৈন্যদলের নিশানে, ভোজসভার টেবিলের চাদরে, সুলতানের পদচুম্বন করা রাজদূতের ভেলভেট কাফতানে, আর যেখানেই তলোয়ারের কথা, যা বাচ্চারা শুনতে ভালবাসে, সেখানে আমি অবশ্যই ছিলাম। হ্যাঁ, সুন্দর কাঠবাদামের মতো চোখওলা শিক্ষানবিশরা দীঘল তুলি দিয়ে আমাকেই টেনেছে হিন্দুস্তান আর বুখারা থেকে আনা মোটা কাগজে। আমি রাঙিয়েছি উশাক গালিচা, দেওয়ালের কারুকাজ, লড়াকু মোরগের ঝুঁটি, ডালিম, রূপকথার দেশের ফল, শয়তানের মুখবিবর, ছবির চারধারের সীমারেখার সূক্ষ্মদাগ, তাঁবুর কোঁকড়ানো সূচিশিল্প, খালি চোখে প্রায় দেখাই যায় না কিন্তু শিল্পী নিজের আনন্দে আঁকে এমন ফুল, খোলা জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে রাস্তায় চেয়ে থাকা সুন্দরী মেয়ের ব্লাউজ, চিনির তৈরি পাখির টক চেরি-রঙা চোখ, মেষপালকের মোজা, গল্পকথার ভোরবেলা আর হাজার হাজার, ভুল বললাম, লাখ লাখ প্রেমিক, যোদ্ধা, শহিদের মৃতদেহের ক্ষতস্থান। যেখানে রক্ত ভলকে ওঠে পপি ফুলের মতো সেই যুদ্ধের দৃশ্যে আমি থাকতে ভালবাসি, ভালবাসি সবচেয়ে কুশলী চারণের কাফতানে থাকতে যিনি পল্লিপ্রকৃতির মাঝে সংগীতরস গ্রহণ করছেন আর সুন্দর বালকরা ও কবিরা মদিরা পান করছে। আমি ভালবাসি দেবদূতের পাখা উজ্জ্বল করে তুলতে, আর সুন্দরীদের ঠোঁট, মৃতের মরণক্ষত এবং রক্তের ছিটে লাগা কাটা মুন্ডু।


simoco
MOBILES
Anjali
Rahul
Hello Anjali
Anjali
Hi, How are you doing?
Me...
Rahul
Try this cool app! Free chat, call and more from phone! Try here:
Anjali
I will...thanks!
Rahul
msn
facebook
Friends
simoco
MP3 FM
space
Get GLUED to Social Networking !!!
Features
DUAL SIM / DUAL STANDBY
1000 PHONEBOOK MEMORY
EXTERNAL T - FLASH
FULL QWERTY 48 KEYPAD
CAMERA / FM RADIO / SOCIAL NETWORKING
BLUETOOTH™ / MP3 AUDIO / VIDEO PLAYER
SMS / MMS / GPRS / WAP
HIGH CAPACITY BATTERY
Q-t
SM 1000x
Desh ki dhadkan ko sun
www.simoco.net

রংবাজি ▲ চন্দ্রিল ভট্টাচার্য

গোলাপি যে নামে ডাকো

রুমাল, ফুল, বুড়ির মাথার পাকা চুল, যৌবন, মাংস

ওই যে কুকুরটা শুয়ে আছে দুই থাবার মধ্যে মুখ রেখে, ওকে দেখি? ওর সুন্দর পাটকিলে ঝরঝরে গায়ের নীচবাঁয়ে, দেখুন, একটা ঘা। ব্রাইট গোলাপি। এই দুপুরবেলায় রোদ পড়ে আরও ঝকঝক করে উঠছে। যেন প্রকৃতির একটা গর্বের আধুলি। এই ঘা ছড়িয়ে যাবে পরে, সারা শরীর ভরে দেবে, তখন ঘিনঘিনে হয়ে উঠবে ও, এই অপূর্ব উজ্জ্বল গোলাপি তখন আনতাবড়ি ক্রিসক্রস খাবে খয়েরি, লাল, ভেগনো-বেগুনি, আরও বহু ইতর রঙের কাছ থেকে, খুব সম্ভব দগদগে ক্ষতের চিড়বিড় যন্ত্রণা ও জ্বলুনির চোটে মরেও যাবে কুকুর। কিন্তু এখন ঘা সবে শুরু হচ্ছে, টাটকা আছে, তাজা, তকতকে। লাবণ্যময়। কুকুর তার পরিণাম কিছুই জানে না, মাঝে মাঝে আড়ে চেয়ে দেখছে নিজগায়ে এই নতুন গয়নার দিকে, সস্নেহে চেটেও দিচ্ছে। অল্প বেদনা যেমন আরামের, যে আমোদ পেতে লোকে প্রায় সেরে আসা ফোঁড়া অনেকক্ষণ ধরে ঠোঁট মচকে টিপেটুপে দেয় কিংবা দাদ পোষে কোমরের কষিতে, প্রায় সেই আহ্লাদে ডগমগ জানোয়ার চুপটি করে ভাবছে, কী সুন্দর গোলাপি বন্ধু এসেছে আমার কাছে, দেখেছ?

আমারও গোলাপি ঘা হয়েছে অনেকবার, বিশেষ করে ছোটবেলায়। খেলতে গিয়ে কেটে যেত, ছেঁচে যেত। মুক্তোর দানার মতো পুটুস পুটুস খোস হলে যেমন তাদের ভালবাসতাম, তেমনি ভালবাসতাম পড়ে গিয়ে ছড়ে যাওয়ার পর, ছাল উঠে যখন বেরিয়ে পড়ত গোলাপি। আমি তার পাশে নীল ডটপেন দিয়ে বহুক্ষণ ধরে বর্ডার দিতাম। একদম ধার ঘেঁষে ঘেঁষে, যেন একটা আঁকাবাঁকা নদীর পাশে পাশে গাছ পুঁততে পুঁততে চলেছি। একটু চুলকোনোও হত, পড়ায় ফাঁকি দিয়ে একটা কাজ করাও হত, এখন ভাবলে মনে হয় একরকমের আভাঁ-গার্দ শিল্পও শুরু করেছিলাম। এবড়োখেবড়ো বর্ডার শেষ হলে, ডার্ক নীলের মধ্যে গাঢ় গোলাপি ঘা-কে দিব্যি দেখাত। যেন আলপনার মধ্যিখানে অধিষ্ঠিত ব্যথা। (প্রায় রবীন্দ্রনাথের মতো বললুম, না?)! লাগে বলে ওখানটায় সাবানও মাখতাম না। কিছুদিন পর তবু নীল মিলিয়ে এলে, আবার রং দিতাম। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে, একলা ঘরে, ঘুমনোর আগে, মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম। একটি প্রাকৃতিক রং আর একটি কৃত্রিম রঙের যুগলবন্দি ঝলকাচ্ছে আমারই সবচেয়ে আপন এলাকায়, তাকে আমি বয়ে নিয়ে যাচ্ছি, লুকিয়ে রাখছি, একমেটে দোমেটে করছি, চিপকে ধরছি, আর আনন্দঘাতী বড়রা অবধি নাক গলাতে পারছে না, এ তৃপ্তি আমায় ভরিয়ে রাখত। তারপর সুস্থতা জেঁকে বসলে, খয়েরি ডট ডট এসে নতুন চামড়া গজাবার প্রক্রিয়া শুরু করে দিলে আলাদা কথা। আরোগ্যের আনন্দ হত, জায়গাটা দেখতে বীভৎস লাগত। কিন্তু আমারই মাংস কিছুদিন আমার কাছে বেড়াতে এসে ফের আড়ালে চলে গেল, এ-কথা মনেও থাকত বেশ।

অপূর্ব ও ছড়ানো গোলাপি দেখতে এখনও অটো থেকে ঝুঁকে পড়ি, পাঁঠার মাংসের দোকানের সামনে। সাদা আর গোলাপির কম্বিনেশনে পাঁঠাদের টানটান শরীর হুক থেকে ঝুলছে। যেন চিতা দৌড়তে গিয়ে ফ্রিজ হয়ে গিয়েছে। মসৃণ, টনকো, টগবগে। নতুন স্নান করানো হয়েছে, একেবারে ঝকঝাক করছে। প্রাণের বিজ্ঞাপন। দেখামাত্র জিভে জল আসে, মনে প্রসন্নতা তুরতুর করে। ভাবলে এমনিতেই বোঝা যাবে, পৃথিবীর সর্বাধিক আনন্দবস্তু ঈশ্বর নন, মাংস। পৃথিবীর অন্য যে কোনও বস্তুর ক্ষেত্রেই আনন্দের ফুরন-তারিখ আছে। একটি মনের সঙ্গে বাঁধা পড়ে যাওয়া, বা একটি সমর্পিত শরীর আস্বাদ করা, এই অলীক কাণ্ডেও গোড়ায় গোড়ায় আমরা যে আনন্দ পাই, ধীরে, অভ্যেস হয়ে গেলে, তা নিশ্চিত ক্ষয়ে আসে। একে বলে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতা। অর্থনীতির পরীক্ষায় ষোলো নম্বরের উত্তর লিখতে হয়। কিন্তু সেই ছোটবেলা থেকে 'আজ মাংস' শব্দগুচ্ছ শোনামাত্র মন তুরীয় পুলকে নেচে ওঠে, সিনিক-অব্দেও তার তীব্রতা অ্যাত্তটুকু কমে না। পেছনপাকা বিয়েবাড়ি গিয়ে যদি শুনি 'একটু অন্যরকম মেনু করলাম, মাংস রাখিনি', তক্ষুনি সে নেমন্তন্নের তাবৎ টুনি চোখের সামনে নিভে আসে। সেই অবিনশ্বর ও চিরফুর্তিপ্রদায়ী মাংসের প্রতীক ওই সারে সারে ঝুলন্ত গোলাপি। ওই রঙে ধরা আছে পুষ্টি, তুষ্টি, অনাবিল আহ্লাদের গুষ্টি ও সপ্তাহান্তে মিষ্টির মিষ্টি রবিবারের গোটা আনন্দ-প্যাকেজ। এমনকী যে কুষ্মাণ্ডরা পাঁঠা খেতে পায় না, চিকেন চুষে জীবন বিতায়, তারাও গোলাপি চিঠিই পায়। গোড়ায় মুরগি কিনতে গিয়ে আমি তাকাতাম না, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখতাম। তারপর সে ভণ্ডামি একদিন জোরসে দূরে সরিয়ে দেখি, মুরগির মাথা কাটার পর ডানা কাটার পর সমস্ত পালকগুলো টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে যেই জলে বারকয়েক চোবায়, আর দু'মুহূর্ত যেন সত্যের প্রদর্শনী হিসেবেই তুলে ধরে থাকে, মনে হয় ধরণী পরে এল এক অপূর্ব নলেন গোলাপি ছটফটে শিশু, কবন্ধ বটে, কিন্তু খুশমেজাজ-সরবরাহকারী। মাথা নেই, হাত-পাগুলো এইটুকু ছোট ছোট, শেষ হয়নি এখনও, কিন্তু ভগবান তাকে একটু তাড়ার মাথায় ছোট্ট চাঁটি মেরে পাঠিয়ে দিয়েছেন 'যা' বলে। গোলাপি সেই ফুরফুরে বাচ্চার কাঁপা কাঁপা ধড়ফড়ে নাচ শেষ হয়ে গেলে, পিস পিস হয়ে সে ঢুকে পড়ে থলেয়, আমাদের দুপুর-



ভোজের উৎসুক অপেক্ষাকে ছাপিয়ে দিয়ে যায় গোলাপি রঙে।

গোলাপি যৌবনেরও রং। মানে, যৌবনোদ্ধত শরীরের কথা বলছি। আমরা তো ফর্সাকেই ফ্যান্টাসির বাহন ধরেছি। কোন পর্নো-উপন্যাসেও পড়েছিলাম, চাকর বলছে, ওই বাড়িতে কাজ করে হেভি আরাম, বউদি এমন করে বসে, শাড়ির ফাঁক দিয়ে অনেকটা গোলাপি দেখে নেওয়া যায়। আমাদের শিখতিপড়তির বয়সে ইন্টারনেট আসেনি, দিশি কালোকুলো অলজ্জতা সুলভ ছিল না, ব্লু-ফিল্ম শুধু মেমসাহেবদেরই যোজন যোজন গোলাপি আমাদের চড়কগাছ-সত্তায় ছুড়ে মেরেছিল। উরেব্বাস, সে কী গোলাপি রে! সেই অপূর্ব বেহায়াপনা, সেই গোরা স্বাস্থ্যের তড়পানি, সেই ঘুঁষির মতো সপাট উন্মোচন আমাদের ঝুঁটি পাকড়ে টুঁটি অবধি ডুবিয়ে রেখেছিল যখন, চৌপহর চৌদিকে শুধু গোলাপি দেখেছি। বাস্তবে চেয়েছি কাজলকালো মেয়েদের, শ্যামলা কিশোরীর পানে ছুড়েছি চিরকুট, কিন্তু লাগাম খুলে ইচ্ছেকে যখন ছুট-হুকুম দিয়েছি, কোনও কথা নেই, সে চোঁ-চাঁ গোলাপি প্রান্তরে। যে কোনও এশীয় পুরুষের জীবনেই একটি নখ অবধি শিউরে-ওঠা ঘটে, যখন সে (সাধারণত ফিল্মেই) প্রথম আবিষ্কার করে, বিশ্বের অন্য গোলার্ধের রমণী-চিহ্নেরা গোলাপি। অ্যাঁ, সে ভাবে, অ্যাদ্দুর! খয়েরি নয়, বাদামি নয়, গোলাপি! গোলাপি বৃন্ত, গোলাপি মধ্যাঙ্গের বিস্ময়-উদ্ভেজ তাকে নাহক পঁয়ত্রিশটি বিস্ফোরণ দেয়। যৌনতার আত্মার রং নিশ্চিতভাবেই লাল, কিন্তু যৌনতার বাহারি ওড়নাটি গোলাপি। ভিতু কুঁজোটে বাঙালি তাই লাস্ট বেঞ্চে বসে অফিসের বারান্দা দিয়ে ঝুঁকে নিঝঝুম পার্কে জাবর কাটতে কাটতে গোলাপি বউদি গোলাপি প্রতিবেশী-মেয়ে গোলাপি রিবন-বদ্ধ বেণী দ্যাখে, দেখতে পায় গোলাপি ধকধকে নরম দেওয়ালওলা বাড়ি, গোলাপি কোমল মাটিওলা দ্বীপ, গোলাপি আবিরে ধড়াসধড়াস চিলেকোঠা। সন্ধের গোলাপি মেঘে সে ফটাৎ দেখতে পায় তোশকের তলায় লুকনো পত্রিকার প্রচ্ছদ। আর তার হঠাৎ মনে হয়, আরে! সাদা বা কালো, বর্ণনির্বিশেষে উপরের আচ্ছাদনটি সরালে, গোলাপি তো শিশ্নমুণ্ডেরও রং। বিশ্বের সব পুরুষ তো এই যৌন-পতাকার একই রঙের তলায় সমবেত! 'উতল হাওয়া'-য় তসলিমা অবিশ্বাস্য লিখেছিলেন, 'পুরুষাঙ্গের গোড়ায় একটি লাল ফুল। এই বাসরশয্যায় আমার প্রথম রাত্রিযাপনে কেউ কোনও ফুল বিছিয়ে দেয়নি। না গোলাপ, না গাঁদা, না জবা, না জুঁই। রুদ্রর পুরুষাঙ্গের ফুলটিই আমাকে ফুলশয্যা দেয়।' যৌন ঘনিষ্ঠতা নিয়ে লেখা মিষ্টিতম, অতুলনীয়তম পঙক্তিনিচয়। হ্যাঁ, লাল লিখেছেন উনি, ঠিকই, কিন্তু, গোলাপিও তো। লাল থেকে তার তুঙ্গ-তীব্রতা সামান্য হরণ করলে আর স্বভাব-স্নিগ্ধতা সামান্য যোগ করলে যা হয়, তা তো গোলাপিই। ওই ফুল গোলাপি থাকে, আবার লাল হয়, ফের গোলাপিতে ফেরে, তার ভেতরটায় ধকধক করে লালের চেতনা। এই যাতায়াত, এই মধুযাতায়াত, এই চোয়ালে চোয়াল চাপা, খর, খোয়াওঠা যাতায়াত তাকে চিড়িক-চিড়িক স্ফুলিঙ্গময় রাখে, বিদ্যুতের নীল, আগুনের লেলিহান হলুদ, লোভের একবগ্গা ইস্পাতরং লম্বা লম্বা আঙুলে আঁচড় মেরে গরগরে লালের দরজা খুলে দেয়, কিন্তু এই সমুদয় আখ্যান যখের ধন আঁশদুপুরের রোদ খিদেরাত্রির মেঘ পোয়ায় বসে বসে যে, তালুতে যে লোফে আর গড়ায় সমুদ্রের শব্দধরা ঝিনুক, নিজেকে কোলে নেয় বা দূরে ফ্যালে বিপুল সিংদরজার পেতল-নকশা খুঁটে খেয়ে, সে গোলাপি। অভ্রান্ত গোলাপি।

আর গোলাপি কে? রবার। যার ভালনাম ইরেজার। সে আবার যে-সে নয়, সেন্টেড। সুগন্ধী। এমন বস্তু, যে বেস্টফ্রেন্ড-ও চাইলে দেয় না। মৌরি লজেন্স দেব বললেও না। কখনও সে খাতা পেন্সিলের পাশে পড়ে থাকে এমনিই, একা, আদুড়, এত লোভনীয় যে মনে হয় এক কামড়ে খেয়ে নিই। কখনও সে আসে একটা কুকুরের পেটের মধ্যে, বা একটা জোকারের, বা একটা ফুটফুটে হাসিমুখ পুতুলের। ছোটবেলায় যদি কেউ হঠাৎ চেঁচিয়ে বলত 'তিন বর', নির্ঘাত নিতাম তিনটে অমন রবার। আমাদের ক্লাসে প্রায় সবার রবারই গোলাপি, তুলতুলে নরম, অভিজাত। আমারটা খড়খড়ে, সাদা, ধ্যাপকা। মুছতে গেলে কালো কালো শুঁয়ো শুঁয়ো বেরোয় কাগজ থেকে। কী আর করি? কৃপাভিক্ষু টাইপ তাকিয়ে থাকতাম। টিফিনের ডিমফিম দিয়ে খুব ধরাধরি করলে একটা ছেলে সামান্য ধার দিত। হয়তো একটা অক্ষর মুছতে দিল। তারপর একটু শুঁকলাম। তারপর শুঁকলাম মুছে দেওয়া অক্ষরের জায়গাটা। বাড়িতে বললে সাফ জানিয়ে দিত, ও-সব হবে না। পড়াশোনা করতে ইস্কুল যাচ্ছ, বাবুয়ানি করতে নয়। খুব যে রাগ হত, বা অভিমান, বললে মিথ্যে হবে। কেমন যেন জানতামই, আমি রব হ্যাভ-নটের দলে। জুলজুলিয়ে নিরামিষ উঁকি মারতাম। যে ছেলে বা মেয়ে আবদারের চোটে বাড়ির মন গলিয়ে নতুন আনত সেন্টেড রবার, কী তার সেদিন ব্যাগ খুলে পেন্সিল-বক্স বের করার ঢং, কী রবারটিকে আস্তে আস্তে যবনিকা সরিয়ে স্টেজে আনা, কী তার খাতার পুবে-পশ্চিমে ভুল করার ঘটা। বিরক্ত হয়ে মুখে 'প্লিচ' 'প্লিচ' করে শব্দ বাগায়, আর ঘন ঘন মোছে। বেঞ্চের ডাইনে তিনজন বাঁয়ে তিনজন সুগন্ধ আর হিংসের চোটে নাক মোচড়ায়। গোলাপি রবার তার নমনীয় শরীর নিয়ে ভুল পাটিগণিতের ওপর ইদিক-সিদিক নাচে আর বড় বড় আঁখিপল্লব পিটপিট করে।

গোলাপ কিন্তু, মানে ফুলটা, যে নামেই ডাকো, সত্যিই অসহ্য। গন্ধটা অবধি ন্যাকা লাগে। গ্রিটিংস কার্ডের দোকানে তাকভর্তি জ্যাবড়া জ্যাবড়া গোলাপ আঁকা কার্ড, প্রেম-কর্নার। হাবিজাবি ইংরিজি লেখার পাশে মুখটি গ্যাদগ্যাদে হাসিতে কুলকুচি করে পুষ্পমশাই ফুটে রয়েছে ভালবাসার অফিসিয়াল দূত হিসেবে, দেখলেই কেমন আছাড় মারতে ইচ্ছে করে। অ্যাদ্দুর ক্লিশের ঘাড়ে যে প্রেম জানাবার দায়িত্ব দেয়, তার চেয়ে নির্বোধ আর কে? বহু রঙেই ফোটে, কিন্তু ভাই, গোলাপি গোলাপ হচ্ছে ক্লাসিক। দেখলেই একটা সস্তা সেন্টের শিশি, একটা ঘুচিমুচি পাকানো গুমসো রুমাল, একটা চপচপে তেলমাখা মাথা, একটা গামবাটি বড়লোকিনীর এঁটো অন্তর্বাস, একটা ক্ষয়ে যাওয়া রিকশাওলার ঘুমন্ত কষের

নাল মনে পড়ে না? গোলাপের দোষ নেই, কে বা কাহারা খারাপ কবিতা ও গবেট হৃদয়ের কেন্দ্রে তাকে পুঁতে হাওয়া হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ছেলে পকেটমারি করলে তো প্রসবিনী মা-কে জেলে দেওয়ার নিয়ম নেই। গোলাপকেই গাল খেতে হবে। এখন অবশ্য এমন অবস্থা, একছটাক স্মার্ট লোকও ওই ফুলের ক্রোশের মধ্যে ঘেঁষে না। ক্যাবলাদের ফুল, কিচ্ছুই নতুন যারা ভেবে পায় না সেই ফুটোমগজী-দের ফুল, সাধাওন পাবলিকের প্রিয় ভ্যানতাড়া-ফুল হয়ে গোলাপ ভেড়ার পালের মাথায় নাচতে নাচতে চলেছে। এবং উত্তরসূরি হিসেবে, সেই দশা-ই পেয়ে গিয়েছে গোলাপি। সে একটা নির্বোধ শৌখিন রং, বাচ্চাদের আর সুন্দরী বোকাদের চুমুস্পৃষ্ট। মেয়ে-পুতুলের গায়ে, পাতি হানিমুনের বেডকভারে, টেডি বেয়ারের গলার ফিতেয়, উপহার জড়িয়ে দেওয়া চকমকি কাগজে, সারশূন্য পার্টির নেলপালিশে রুজে, ঝিংচ্যাক গাধার চিবিয়ে-চলা বাব্‌লগামে, সাজুগুজু যুগলের মধ্যিখানে চুপচাপ গলতে থাকা স্ট্রবেরি আইসক্রিমের শরীরে, সে পড়ে পড়ে হাঁপাচ্ছে।

কিন্তু এই যে গোলাপিকে ক্লিশে বলাটাও ক্লিশে হয়ে গিয়েছে, এর আবার ফিরতি সম্মান-সিঁড়ি আছে। সত্যি। বিশ্বের অনেকেই ক্লিশে তুলে নিয়ে তার কাদাটাদা ঝেড়ে জেদ করে এমন ডাঁটো অহংকারের সঙ্গে লকেটে ঝুলিয়ে রেখেছেন, লোকের বিস্ময় বেয়ে ক্লিশে নয়া মানে পেয়ে যায়। এবং অবশ্যই সেই ক্লিশে-ব্যবহারকে স্থাপিত করতে হয় একটা নয়া ভাবনার ভিতপাথরে। গেঞ্জি উল্টো পরার মতো, ক্লিশেটার সেলাই-টেলাই বের করে ব্যবহার করতে হয়। লুই আরাগঁ যখন নিজেকে উভকামী হিসেবে ঘোষণা করলেন, আর সমকামীদের মিছিলে যোগ দিলেন (কারণ আসলে ঘোষণাটা তো 'হ্যাঁ, আমি সমকামীও'), তিনি চড়ে গেলেন একটা কটকটে গোলাপি গাড়ি। সমকামীদের, রূপান্তরকামীদের এখন অফিসিয়াল চিহ্ন-রং হল গোলাপি। তাদের কাগজের নাম 'পিংক', তাদের টিভি-চ্যানেলের নাম 'পিংক'। গোলাপিকে মেয়েদের বোকা-বোকা রং হিসেবে দেখা হয়, তাই সুইডেনে-এর র‍্যাডিক্যাল ফেমিনিস্ট পার্টি নিজেদের রং বেছেছে গোলাপি, মার্কিন নারী-অ্যাক্টিভিস্ট দল নিজেদের নামই রেখেছে 'কোড পিংক'। অর্থাৎ কিনা, নে শালা, গোলাপি একটা মিষ্টি মিষ্টি গাড়ল গাড়ল রং তো, সেটাই তো মেয়েদের জাতীয় রং, কারণ নারীরা হয় পিতপিতে মিঠে নির্বোধ, তবে শোন, এই রং-ই নেব আমাদের নিজস্ব করে, আর গোলাপি পোশাকেই গোলাপি লিফলেটেই গোলাপি সাজগোজেই এমন বার্তা এমন প্রতিজ্ঞা এমন ত্রিশূল ঝাপটাব পুংতন্ত্রের মুখে, নারীকে ক্লিশে-চশমায় দেখার আগে সতেরোবার কাঁচুমাচু ভাববি, ফ্রি-কিকে দাঁড়িয়ে থাকা ডিফেন্ডারদের মতো অঙ্গ আড়াল-করা ঠাটে। দিনের পর দিন মাটিতে মিশে গিয়ে কুয়োয় গুঁজড়ে 'ধর্ষিতা' 'ধর্ষিতা' শোনার পর যখন কেউ আর না-পেরে ফিরে দাঁড়িয়ে জোরগলায় 'আমার নাম ধর্ষিতা চট্টোপাধ্যায়। আপনার?' বলে ওঠে, তার মধ্যে যে অভিমান আর লাথি ঝিকিয়ে থাকে, এ হচ্ছে গোলাপির সেই-মাফিক প্রয়োগ। মনে আছে, গত বছর মৌলবাদী ফরমান জারি হয়েছিল, বার-এ মেয়েরা যেতে পারবে না, তাদের মদ সার্ভ করা হবে না, আর ভ্যালেন্টাইন'স ডে-তে কোনও যুগলকে দেখা গেলে তক্ষুনি তাদের হিঁচড়ে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে? ম্যাঙ্গালোর-এর 'শ্রীরাম সেনা' নামে একটি সংগঠনের প্রধান, প্রমোদ মুতালিক, এই শয়তানিটি মগজ খুবলে বের করেছিলেন। প্রতিবাদে ১৪ ফেব্রুয়ারি দলে দলে মেয়েরা করলেন কী? প্রমোদবাবুকে কুরিয়ার করে শ'য়ে শ'য়ে গোলাপি প্যান্টি পাঠালেন। এর নাম হয়েছিল 'পিংক চাড্ডি ক্যাম্পেন'। মেয়েরা তো নরম, আর অবলা, তাদের প্রেম করা আর মদ খাওয়া বারণ, ভারতীয় সংস্কৃতি মানতে গেলে আর পবিত্র টসটসে থাকতে গেলে শুধু প্রমোদবাবুর আর অন্যান্য অনুরূপ শূকরের মতানুযায়ী চলতে হবে, তাই এই অবোলা কোমল রংটি ও তাদের আদত নারী-অঙ্গ ঘিরে রাখা পোশাকটি একযোগে ওঁয়ার উদ্ধত মুন্ডুতে ছুড়ে মারা। সেদিক থেকে গোলাপির বহুত প্রাপ্য কুর্নিশ আছে ভাই। ওই রংকে আঁকড়ে 'নেকুপুষু'-ছাপ্পাধারীর স্লো মোশনে বজ্রকঠিন ফিরে তাকানোর অনেকানেক সিন রচিত হচ্ছে, ললিত শাখে ফুটে উঠছে শান্তিপূর্ণ ঢিসুম।

এবার তা হলে পড়ন্ত রোদে ওই যে গাড়িটা ঠেলতে ঠেলতে আসছে একজন, ওকে দেখি? ও নিয়ে আসছে বুড়ির মাথার পাকা চুল। দেখেই মনে একটা টানা ঠান্ডা মেঝে। আর ঠাকুমার বকুনি, আর আমার আর বোনের হিহিহুহু দৌড়োদৌড়ি, ফের বারান্দায় ঝোঁকা, আর আশ্চর্য ঝলমল দুপুর। ও বুড়ির মাথার পাকা চুল, বুড়িরমাথারপাকাচুল! গোলাপির গোলাপি, মিষ্টির মিষ্টি। খেলেই সারা মুখে ছোপ ছোপ শৈশবস্মৃতির মতোই, গোলাপি গোলাপি রং। চিটচিট করবে, মোটে ধুতে ইচ্ছে করবে না। ওই গোলাপির মধ্যে আমাদের পাকামি শিখে যাওয়ার আগের, স্মার্ট হওয়ার দায়ের গর্তে পড়ে যাওয়ার আগের সব সকাল-সন্ধে আছে, যখন রোদ্দুরের বল্লম অন ডিউটি পরপর দাঁড়িয়ে স্যালুট ঠুকত, ল্যাম্পপোস্টরা চনমনে বাল্বে সেজে উঠে বলত, 'কী রে?' আর ওই যে মেয়েটি, মানে আপনি বলবেন বয়স্কা মহিলা, কিন্তু ছি অমন বলতে নেই আর যতই চর্বি জমুক মুখটা এখনও ঢলঢলে, এককালে ডেলি দুপুরে আমায় টুকটুকে গোলাপি জিভ বের করে ভেংচি কাটত, জানেন? কী সব পুরাণকবিরা নারীর সাতশো সাতাশি রকম ব্রীড়ার কথা বলেন! ভেংচির কাছে কিছু লাগে না কি? ওই গোলাপি জিভের বাঁকা ভঙ্গি দেখার জন্য কলেজ যাইনি, ব্যাঙ্ক-এ যাইনি, দাদার বউভাতের সকালে যাইনি। এক-একবার চোখ বুজে মুখটা কুঁচকেমুচকে ঘাড় নাড়িয়ে ভ্যাংচাত, আর আমার মনে হত, কে শালা চুম্বনের কদর রটিয়েছে! হৃদয়ে সটাসট গোলাপি স্ট্রাইপ পড়ে যেত। অলৌকিক আনন্দের বুটি! এখন হাঁটছে দেখুন, সম্রাজ্ঞীরই মতন। স্টাইলও আছে, বরও বড়লোক, বনেদি ঘর। পায়ের পাতায় চোখ চলে যায়, আলতা রাঙানো। মানে, আলতা পরেছিল দিনকয়েক আগে, এখন ফেড হয়ে গিয়ে, উঁ, অব্যর্থ, গোলাপি!

কালোয় মিলালো আলো

রাত্রি, ব্ল্যাকহোল, চুপ, পাথর, ছেড়ে যাওয়া, লাথি

নেই—আর কোনও আলো নেই—
এই তো নিভিয়ে দিলাম সব—বন্ধ করে দিলাম সব ক'টা দরজা, জানলা, ঘুলঘুলি, ফুটো, ফাটা—এ যেন এখন সত্যবানের ঘর—বাতাস ঢোকারও ফুরসত রাখিনি—কালো, তুমি পালাও দেখি এবার—

কালো, আমি তোমায় দেখব বলে, চোখ বন্ধ করেছি কত—কতক্ষণ একটানা—সময়ের কোনও হিসেব রাখিনি আমি—তবুও, আসোনি আজও—হয়তো, আসতে—হয়তো, আরও খানিকটা, আরও অনেকটা সময় বুজে থাকতে হত চোখ—সত্যিই হয়তো শেষে তুমি নেমে আসতে ঠিক—এই যে চোখ বুজলেও, ভেতরে খানিকটা আলো থেকে যায়—হয়তো অনেক অনেকক্ষণ পর, একসময় নিভে যেত তাও—মানুষ যেমন একেবারে চোখ বোজে—সেই যে অনন্তকাল একটানা আলোর আকাল শুধু—কতক্ষণ? ঠিক কতক্ষণ সে ব্রত? ঠিক কতটা উপোসে সন্তুষ্ট হও তুমি? হয়তো, আমিই ধৈর্য রাখতে পারিনি শেষমেশ—কী জানো, একটা কেঁপে উঠলেই, ভেবেছি, এলে বুঝি—ভেবেছি, চোখ মেললেই দেখব, দিব্যি সামনে, দাঁড়িয়ে তুমি—দেখবই, দেখবই—কী অসম্ভব বিশ্বাসে ফের তাকিয়ে উঠেছি প্রতিটিবার—চেয়ে ফেলেছি আমি—
কেন চাইলাম? কেন চাইলাম? কেন না চেয়ে থাকতে পারি না আমি? চেয়ে তো তোমায় কখনও পাব না, জানি—তুমি যখন আসার, আসবে—তুমি নিজের খেয়ালে আসতে—আসার হলে আসবে, না-আসার হলে না—আমার কান্না, কষ্ট, কাকুতি, মিনতি, হাতেপায়ে ধরাধরি, ভেঙে পড়া, ছেতরে যাওয়া, কিছুতেই তো কিছু এসে যায় না তোমার—এসে তো যেতও না কোনওদিন—ওসব ন্যাকামি, ওসব নাটক, ওসব লোকদেখানি অ্যাক্টিং তোমায় ছুঁতে পারে না, ভোলাতে পারে না, বলেই দিয়েছ তুমি—ওসবে কখনও ফিরেও তাকাওনি—অথচ, তুমি চাইলে চিরকাল যেতে বাধ্য ছিলাম আমি—আগেপিছে না ভেবে, ভালমন্দ না বুঝে—গতদিনের সব ট্যারাব্যাঁকা বাত, সব অবহেলা, সব পায়েঠেলা, সব অপমান ভুলে, যেতেই হবে আমায়—তোমার খুশিতে বাঁশি হতে হবে, তোমার পিরিতে দেহ—নইলে তুমি আর থাকবে না আমার—শুধু হুমকি, শুধু হুমকি—তোমার ব্ল্যাকমেল হল অভিমান, আর আমার অভিমান ব্ল্যাকমেল, কালো, তোমার চাই মানে চাই—আর, আমার হলে দূরছাই—এই তো তোমার আইন—এই যে এত ডাকি, সারাক্ষণ শুধু তোমার ডুবে বুঁদ হয়ে থাকি একা—তোমার বিকার নেই—কালো, তোমায় কি শুধু মন দিয়ে ডেকে হয়? মন প্রাণ সব উজড়ে না দিলে নয়—প্রাণ ল্যাগে, প্রাণ লাগে, কালো, তুমি নিজের মুখে দাবি করো না, জানি—তবু লাগে—সব কথাই কি বলে দেবে নিজে? তোমার উদার মূর্তি নষ্ট হবে না, বলো?
কালো, আমি পারি না আর রইতে—না পারি আর এ ছিবড়ে-জীবন বইতে—আজ, হয় তুমি নিজে থেকেই আসবে, নইলে আমিই যাব সব ছেড়েছুড়ে ফের—আমিই যাব—আমিই তো যাই—চিরকাল গিয়েছি আমিই—মাঝরাত্তিরে, বাড়িঘর ছেড়ে—এককাপড়ে বনবাদাড়ে কাঁটা ফুটিয়ে রক্তপায়ে—তুমি তো খালি হাতপা ছড়িয়ে বাঁশি বাজিয়েছ শুধু—আর, আমার ভরসায় থেকেছ চুপচাপ—আমি আসবই—আমি আসবই, তুমি জানো—মাথা নিচু করে গিয়ে ঠিক পড়ব তোমার পায়ে—সব আমারই দোষ, সবটা আমার, বলে মানাব তোমায় ফের—তবে গিয়ে তুমি একটু প্রেম ছুড়ে দিয়ে ধন্য করবে আমায়—তুমি জানো—তুমি জানো—আমি নিরুপায়—আমি নিকিরি, ভিখিরি, গাধা—তোমার বাঁধা রাধা—
অথচ, যবে চলে গেলে একেবারে, বলেও গেলে না কিছু—কবে ফিরবে, আদৌ ফিরবে কি না, তারও কোনও কথা নেই—আমি মাঝখান থেকে বোকার মতো অপেক্ষা করে মরি—বনেজঙ্গলে ঘুরি—যমুনাপানে ভ্যাবলার মতো চেয়ে থাকি চাতকের মতো হাঁ—মাঝরাতে উঠে ছুটে চলে যাই কুঞ্জবনে একা—সকলে কত বলেছে আমায়—ওরে, আর ফিরবে না কালো—আমিও যে বুঝি না, তা নয়—তবু, তুমি তো নিজে বলোনি মুখে—আমি আশা কি করে ছাড়ি? প্রদীপ জ্বেলে বসে থাকি কি জোস্‌নার রাতে—তমাল গাছটা জড়িয়ে কাকভোর—ময়লা তোলার গাড়ি এসে ডাকে—কী রে, ঘর যাবি না তোর?
তুমি আসবে না, কালো, আসবে না তুমি—চিরদিন যা হয়েছে, আমাকেই যেতে হবে—কালো, আমি আজ তোমার কাছে যাবই—পাবই তোমায় আজ—হারাতে দেব না আর—আর কোনও আলগা দেব না আমি—আজ সব দিক আটকে আমি বন্দি করব তোমায়—বারবার চোখ খুলে ফেলি—আমি



চোখ খুলে ফেলি, আর তুমি পালিয়ে যাও—তাই আজ আর নিজের ওপর ভরসা করিনি আমি—সব ঘুটঘুটে করে দিয়েছি নিজে হাতে—চাইলে যেন দেখতে না পাই আর—এই আমি চোখ বুজলাম—ওই আলো, ওই আলো—যা, যা, হুস্—উফ্—যায় না—চোখের ভেতর ঢং করছে ঢ্যামনা আলো ফালতু—ভাল্লাগে না, ধুর—এভাবে চোখ বুজে থাকার কি মানে থাকে?

কী মানে থাকে এত জোগাড়যন্ত্রের! এত খেটেখুটে সব আঁটবার! এই তো—চোখ মেললেই, ফের বুঝতে পারছি দিব্যি—এটা বিস্‌না—তোশক, গদি, চাদ্দর—মাথার নীচে একটা বালিশ—তার পাশেও একটা বালিশ—তার পাশেও একটা বালিশ—ওধারে দেওয়াল—তাতে জানলা দু'টো—পর্দা ঝুলছে থ—ওপরে ফ্যান—তার ওপরে সিলিং—ঝুল কাঁপছে তিরতির—সোজা আমার দিকেই চেয়ে একটা মরা মাকড়সা—

আমি পাগল নই, বিশ্বাস, করো—কালো, পাগল নই আমি—আমি বুঝতে পারি সব—সব শুনতে পাই—সব দেখতে পাই—আলোয় আরশিমাঝে তুলে দেখি এই মুখ—কত অপমান, কত ব্লেড চালানো নুনজ্বালানো কথা—ফেলে যাওয়া মানুষের মুখে অবহেলা জমে জমে ছোপ ছোপ ছোপ ছাতা পড়ে যায় ক্রমে—আমি দেখতে পাই—স্পষ্ট সে ছিটি ছিটি ঘা বুঝতে পারি দেহে—

শুধু দেখতে পাই না তোমায়—

সেবার কোথায় যেন যাচ্ছি সবার সাথে—রাতে— ঘুমিয়ে পড়েছে ওরা—আমি একা ট্রেনের গেটে বসে—ধানবাদ পেরলো—তারপর, আরও একটা কী—তারপর অনেকটা পথ ধু ধু—কামরার আলো ওই যতটা, পড়েছে, পড়েছে—তারপর রেললাইনের খোয়া—তারপরে একটু জমি—একটু ঘাস, গুল্ম, ঝোপ—ব্যস—আঁধার—টানা আঁধার—একটা টিমটিমে কিছুও না—কিছু না—দূরে একটা ল্যাম্পোস্ট না, দুয়েকটা কুঁড়ে না—আকাশে তারা না, তারাখসাও না, একটা নখকাটা চাঁদেরও বংশ নেই কোথাও—লাল হয়ে মেঘ, বিদ্যুৎ, বক—তাও না—কোথাও কিছু নেই—টাটাক্‌টা টাক্, টাটাক্‌টা টাক্—একটা লাইন বেরিয়ে গেল হুড়মুড়িয়ে, ওইদিকে—কোথায় গেল? ওদিকে তো কিছু নেই—

একবার মনে হল, ঝাঁপ দিই ওই পানে—

যারা বোঝে না, তারা সব নাকি জানে—যেখানে নাকি আলো নেই, তাই কালো—আসলে মানে, জানে না মোটেই—আসলে আঁধারকে ভাবে কালো—ওরা তো কখনও চোখ বুজে দেখেনি একটানা—আমি দেখেছি—আমি নিজে দেখেছি বহুবার—আঁধার—কালো সে নয়—আর যাই হোক, কালো নয় কিছুতেই—সে বড়জোর কালোর মতো কিছু—এই যে বলে, কালো চুল, কালো চোখ—কালো রাস্তা পিচের—অমুকের কালো হাত—তমুকের কালো প্রেসিডেন্ট নয়া নায়ক—ওসব কালো না—কালো না—দেখা যায় না কালো—ছোঁয়া যায় না কোনওদিন—ওরা জানে না—তাই বকে যায় হাবিজাবি—

কালো যে টেনে নেয় সবটুকু—টেনে নিয়ে চলে যায় অতল গভীরে একা—সেখানে দেওয়াল থাকে না কোনও—দিক থাকে না—সময় থাকে না, শব্দ থাকে না কোথাও—যেন সেই যমুনার মাঝখান—তার ভেতর ডুবছে নৌকো—আরও ভেতর, আরও আরও অনেক অনেক ভেতরে এক ঘোর—এক হুঁশহারানো ঘোর—টেনে নিয়ে চলেছ কোথায়, জানা নেই—জানার খেয়ালও নেই মাথায়—বাঁচামরার ভাবনা নেই—সময়ের কোনও অনুভূতি-টুতি, শরীরে কোনও সাড়, লাজলজ্জা, ইচ্ছে-অনিচ্ছে, সুখদুঃখ, দেহ, মন, এমনকী ওজন, তাও নেই—কিচ্ছু নেই—কিচ্ছু না—শুধু ঘোর এক—এক নেশা—শুধু তুমি, কালো, শুধু তুমি—শুধু তোমাতে হারিয়ে যাওয়া—সেই তো কালো, সেই তো কালো পাওয়া—

জ্ঞানীরা কোত্থেকে জেনেছে, কালো সব আলো শুষে নেয় নিঃশেষ—ফিরিয়ে দেয় না কিছু—বিজ্ঞানীরা আরেক কাঠি বাড়া—ভেবেচিন্তে অনেক কষ্টে বের করেছে কালো গর্তের গল্প—ব্ল্যাকহোল—সে নাকি সব শুষে নেয়—সব—গোটা ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্ব নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে তার টানে—কেউ জানে না, ওর মধ্যে পড়ে কেন হারিয়ে যাচ্ছে সমস্ত কিছু চোখের পলকে হুস্—জন্মের মতো হারিয়ে যাবে জেনেও, কেন ওই কালোর দিকেই ছুটে চলেছে সবাই—কেউ ব্যাখ্যা বলতে পারে না ঠিকঠাক—শুধু জেনেছে, কৃষ্ণগহ্বর—জানি না, কি করে জানল—আমি কিন্তু কাউকে বলিনি কিছু—কালো, ওসব কি বলার কথা, বলো?

আমি বলেছি, আগুনপাখির গল্প—মরবে জেনেও আগুনে কেমন ঝাঁপ দেয় নিজে নিজে—মরা ভয় পায় না—মরার নেশায় পায়—পাগলামি নয়, পাগলামি নয়—বিজ্ঞানীরা বুঝবে না, সে কী—আমি জানি—আমি জানি সে ঝাঁপের মানে—পাগলামি বলে তুচ্ছ কোরো না তাকে—

আমি পাগল নই—আমি পাগল নই, কালো—আমি সবটা দেখতে পাই—সবটা বুঝতে পারি—শুধু বলতে পারি না—কাউকে বোঝাতে পারি না, তোমাতে একবার ডুব দিলে কি হয়—বৃন্দা বলে, প্রেম—জটাবুড়ি বলে, মরণ—কালো, সত্যিই কি তুমি মৃত্যু? কোন ওয়েবসাইট পড়লাম—দুনিয়ায় কত মানুষ নাকি একেবারে মরে গিয়েও আবার বেঁচে উঠেছে, যিশু—না, না, নাটক না—সত্যি সত্যি মরেই গিয়েছিল তারা—ডাক্তারও পরীক্ষা করে দেখেছিল ব্রেন ডেড—তো, তাদের যখন জিগ্যেস করা হল, কেমন কী সব হয়েছিল সেই কাণ্ড—তারা বলেছে সব—দেখলুম, কালো সুড়ঙ্গ একখান—ভেসে যাচ্ছি তো যাচ্ছিই—এবার যেতে যেতে যেতে যেতে হঠাৎ যেন উদ্ভাসিত আলো—জ্ঞানীরা বলেছে, ওই—ওই মুক্তির আলো—মৃত্যুর পর মুক্তি—আমি বললাম,

ধুর—আলো যদি মুক্তিরই হবে, তবে ওরা আলো পেয়েও মুক্ত হল না কেন? আলো দেখেই কেন ফিরে এল ফের দেহে? আলো নয়, আলো নয়, আসল মুক্তি কালো—ওই সর্বখেকো কালোয় ভেসে গিয়ে, একেবারে হারিয়ে যেতে পারলেই ব্যস ছুটি—চিরনির্বাণলাভ—আমিও তো গিয়েছি কতবার—অনেকটা, অনেকটাই—শেষ পর্যন্ত আর টানলে তুমি কই! কালো, কেন টানলে না আরও? কেন? কেন চলে গেলে তুমি?

হয়তো, সে কারণও আমি জানি—না গেলে তোমার হত না, কালো, না গেলে তোমার হত না—আমার এ ছোট্ট বুক তোমার বাসা নয়—তুমি অনেক অনেক বড়—অনেক বড় হবে তুমি, জানি—বাড়তে বাড়তে গিলে নেবে গোটা বিশ্ব—নইলে আর লোককে কী দেখাবে বিশ্বরূপ! এখানে ছোট্ট ছিল জীবন—লম্ফেঝম্ফে ভরিয়ে রাখতে সব—দস্যিপনা করতে যেমন খুশি—শত অন্যায়, শত শয়তানি করেও পার পেয়ে যেতে ঠিক—কত আদরের ছিলে তুমি—কোত্থেকে এক সান্দীপনি মুনি কী এক মন্ত্রণা দিল কানে—জীবনের আসল নাকি কথা, জীবনের আসল নাকি দর্শন, দিল বিষ—হঠাৎ কী এক ব্রহ্মজ্ঞান দপ্ করে জ্বলে উঠে, চোখ ফোটাল তোমার—মুহূর্তে তোমার মনে হল, শালা, সত্যিই মাইরি—এখানে এ হদ্দি বেন্দাবনে বসে বসে, এ কী তাল পাকাচ্ছি আমি? এসব তুচ্ছ আদর, হাসি, ভালবাসাবাসি, ফালতু যত ঢপের চপ—এসব দিয়ে জীবন চলে নাকি? বি প্র্যাক্টিক্যাল, ম্যান—এই যে ব্রহ্মজ্ঞান—এতে চড়ে কত কত দূর যাবে তুমি—যুগ যুগ ধরে সমস্ত লোক গাইবে তোমার গান—আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবি, এই ফুসমন্তরের ঠিক আগেই তুমি অন্য কেউ ছিলে—কত প্রেম ছিল—খুশি ছিল—আমার জন্য বাঁশি ছিল দিনরাত—এক ফুঁয়ে সব হাওয়া—সত্যি, মন্তরের কী গুণ! ছিলে আমার কালো, হলে গোটা জগতের আলো—চোখ ধাঁধিয়ে যায় আমার—এবার তোমার বড় জীবনের জার্নিপথ শুরু—মহাকাব্যিক জীবন—আমি বড়জোর একটি পরিচ্ছেদ—এইটুকু রোল আমার—এই যে বাকিটা জীবন তুমি শুধু বড় হবে, আরও আরও বড়—বিরাট—মহান—রাজত্বের অধিকারী—ক্ষমতা, খ্যাতি, ক্ষমার অযোগ্য চালাকি, চিটিংবাজি—তবুও যে লোকে তোমায় নোংরা, ঘ্যালঘ্যালে, ঘিনঘিনে, কিলবিলে, বমিরও অধম বলবে না—জীবন তো কখনও থেমে থাকে না ভাই, বলে তুমি যে ধান্দা মেপে বিয়েও করবে পরে—মাঠভর্তি লোকের সামনে বুকনি দেবে মানুষ মারার তরে—নিজের মতোই আর সকলকে বানাবে টানটান—হে ভগবান—জ্ঞানের আলো দেবে, বুদ্ধি দেবে—বলবে, কী করে যে কোনও অন্যায়কে জাস্টিফাই করতে হয় নির্বিকারে—বিরাট কী এক মহাসত্যের জন্য হাজার মিথ্যেও যেন কিছুই না—তাতে সব শেষ হয়, হোক—লোক মরে তো মরুক—হাজারে লাখে লাশ পড়ে তো পড়ুক—পিছনে ফিরে তাকানো কিছু নেই—লোকে তো মরবেই—সকলেই তো মরে—সেন্টিমেন্ট ফেন্টিমেন্ট নিয়ে পড়ে থেকো না, ম্যান, বি প্র্যাক্টিক্যাল নাউ—তোমার এসব শয়তানি বাণী শুনেও যে মুগ্ধ হবে সকলে—খিস্তি করে, ইট মেরে, জুতিয়ে যে তোমায় লম্বা করে দেবে না—বলবে না, হারামির বাচ্চা, থাম—মাঝখান থেকে বেমক্কা কেউ যদি ভুলেও প্রশ্ন করে ফ্যালে, এসব কী যা-তা বলছ তুমি? অন্যায়কে প্রতিষ্ঠা দিচ্ছ এইভাবে? তোমার বিবেক নেই? হৃদয় নেই? মানুষকে কখনও ভালবাসোনি তুমি? তখন, যাতে তুমি সেই বাঁকা হাসিটা হাসতে পারো—হেসে, মুখ ঘুরিয়ে, যাতে উদাস হয়ে যেতে পারো এক মুহূর্তে—শুকনো চোখে শূন্যপানে চেয়ে যাতে একটা ঢোক গিলতে পারো কুঁতে—যেন, কত ভালবাসা ড্যালা হয়ে আছে তোমার গলার মাঝে—যাতে ছাড়তে পারো নাটকীয় সেই দীর্ঘশ্বাস ত্রুটিহীন অভিনয়ে—যাতে তোমার গুণগাইয়েরা স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠে, ধমকে বলতে পারে, তুই কতটুকু জানিস? কতটা চিনিস ওকে? কী জানিস ওর মন? প্রেম? ওর মতো করে ভালবাসতে তুই পারবি জীবনে, শালা? আর, তখন যেন তুমি বলে উঠতে পারো মহাত্মা সেজে, ছাড়ো—যাতে, যে প্রশ্ন তুলেছিল, সেই উল্টে ভাবতে বসে, এমা, ছিছি—কাকে কী বলছি আমি? তোমার যে আসলে নারকোলের ভেতরে একদিঘি জল টলটল, বিশ্বাস করবে সবাই, তার জন্যই আমি—এক অধ্যায় গোটা—তোমারও আসলে মন-টাইপের কি যেন একটা ত্যাপত্যাপে মতো ছিল—তুমি যে আসলে ঠান্ডা মাথার কুচক্রী গিঁট, হিমরক্ত নও—পিশাচের মুখে তাই তো কায়দা করে প্রেমের মুখোশ বাঁধা—কলঙ্কিনী রাধা—

আমি বুঝি, কালো, আমি সত্যিই বুঝি ব্যাপার—দোষও দিই না তাই—এই যে সব জেনেও, তোমার জন্য আজও আমি পাগল—সে আমার পাগলামি নয়, বোকামিও নয়, দুর্বলতাও না—সে যে কী, সে তুমি বুঝবে কোনওদিন—'বি প্র্যাক্টিক্যাল' দার্শনিকরা সে সব বুঝবে না কোনওদিন—

আমি জানি, আমার ভূমিকা শেষ হয়ে গিয়েছে গল্পে—আর প্রয়োজন নেই—তুমি ছেড়ে গেছ, তারপর আমার কী হল, সে তো খোঁজও রাখেনি কেউ—তুমি রাখবে না, জানতাম—কিন্তু, এতগুলো কবি, গীতিকার, ধার্মিক—তোমার মহিমা গেয়েছে—কেউ তো লেখেনি আমার বাকি জীবনের কথা—রিসেন্টলি, কোথায় একটা পড়লাম—তাও বড়ো গুরুত্বহীন, অপ্রমাণিত লেখা—পরে নাকি আমি পাগল হয়েছি বিরহে, আর তারপর, যমুনার জলে ডুবে মরে গিয়েছি শেষে—হাস্যকর—আর কিছু লেখা নেই—

কেনই বা আর লিখবে? পরিত্যক্ত একটা মানুষ—লাথি খেয়েছে যে, সে তো ফালতু

একেবারে—তার জায়গা কোথাও নেই—আমার মুখে শুধু কালি আর কালি—কালো, সেও তোমারই রং—তোমার না-হয় বড় হওয়ার, অনেক উঁচু, অনেক মহান হওয়ারই ছিল—আমায় সঙ্গে নিলে কি ক্ষতি হয়ে যেত কিছু? কলঙ্কগ্রস্ত মানুষের দায় তাই কি নিতে চাইলে না তুমি আর?

তুমি চলে গেছ—আর, আমি, এই যে আধামরণ থেকে ফিরে এসেছি দেহে—এই যে এত আলো চাদ্দিকে—জ্ঞানের আলো—বিজ্ঞানের আলো—বুদ্ধির আলো—শুদ্ধির আলো—এত এত এত চোখধাঁধানিয়া তীব্র—এত সহ্য হয় না আর—এই বিস্‌না—বনের মধ্যে এই যে কুঞ্জবন—ফুলের মোরাম, দোলনা—এই যে ভেঙেচুরে যাওয়া ঘর—সারাগায়ে গেরিমাটি, তাতে ছটোপুটি ছাপ তোমার—এই শরীর, এই হাত, পা, মুখ, মাথা, পিঠ, বুক আর এই যে সুখের অঙ্গ—চোখ মেলে আর দেখতে পারি না আমি—ছুঁতে পারি না, ঠান্ডা—এই যে আমার সবটা জুড়ে গন্ধ তোমার, নিতে পারি না আর—তখনই তো দম বন্ধ হয়ে আসে—মুহূর্তে যেন থমকে দাঁড়ায় সব—তুমি যেমন ভাবতে চিরদিন, এখনও সবাই ভাবে—নাটক—

আর আমি প্রতিবার ভাবি, এইবার নিশ্চয়ই একেবারে সুইচ্‌ড অফ—

এর মধ্যে কবে যেন বেশ, হঠাৎ লোডশেডিং—ধুপ করে আলো চলে যেতে, প্রথমটা কেমন গুলিয়ে গেল সব—ঠিক কতটা সময় জানি না—মনে হল, কিছু নেই—সব শূন্য, শুধু শূন্য—কোথায় মাথা, কোথায় পা, কোথায় কী—বসে আছি না শুয়ে, মাঠে আছি না ঘরে—না কি আকাশে—না কি মেঘে—না কি কালীদহে, যমুনায়—কোনও ঠাওর নেই—কিছুরই ঠিক নেই—কোথাও দিক নেই একটাও—সেই ঘোর—সেই ঘোর—কোন দিকে হাত বাড়ালে যে অ্যাকচুয়ালি কী পাব, কে জানে—আরে, বাড়াব যে, হাত কই? চিৎকার করে ডাকলাম, কোনও আওয়াজ তো হল না—গলাও কি নেই আমার? এ কি সত্যিই সেই ঘোর? কালো, এ কি সত্যিই তুমি? এই তো—এই তো পেয়েছি তোমায়—এই তো ধরেছি পাকড়ে—

ধুর, ধুর—ঠিক কয়েক সেকেন্ড পরেই, সব আবার আস্তে আস্তে ফিরে এল যেন আগের মতোই ঠিক—আবার বুঝতে পারলাম, এটা বিস্‌না—এটা চাদর—তাতে ফুল-ফুল করা ডিজাইন—মাথার নীচে একটা বালিশ—তার পাশেও একটা বালিশ—ওই দেওয়াল—দু'টো জানলা—ভারী পর্দা ঝুলছে লত্‌পত্—ওপরে ফ্যান—ঘুরতে ঘুরতে থামছে—সিলিঙে ঝুলজাল কাঁপছে টানা তিরতির তিরতির—সোজা আমার দিকে চেয়ে আছে মরা মাকড়সাটা—ওই তো ওপাশে দরজা—বেরিয়ে ডানহাতে গেলেই রান্নাঘর—গ্যাসের পাশে দেশলাই আছে কোথাও—মোম আছে তাকে নিশ্চয়ই—আঁধারের এই আলোছায়াটায় সবই বোঝা গেল দিব্যি—

কালো, সেই চলেই গেলে তুমি! আবার! পারলে না ওই প্রথমটুকুকে কনস্ট্যান্ট করে দিতে!

সত্যিই, এত আর ভাবতে পারি না আমি—এত আলোছায়া, এ আঁধারি মায়া সহ্য হয় না আর—এই যে বারবার চলে যাই যাই করেও হুঁশে ফিরে আসা ফের—এই যে দিকবিদিক নির্দিষ্ট জীবন, মন, ওজন, বোঝা—এই যে চাদ্দিকে থিকথিক করছে সব—এই যে তুমি শিখিয়ে দিয়েছো বিজয়মন্ত্র, শর্টকাট সাজেশন—হাজার মিথ্যে, হাজার ভণ্ডামি, চালাকি, চিটিংবাজিতেও যে পাপ নেই এককণা—সেই মন্ত্রে এই যে সবাই জিতছে, শুধু জিতছে, খালি জিতেই চলেছে টানা—সে জয়ী জনতা এই যে এখন ঘিরে ধরেছে আমায়—পাথরের পর পাথর, থুতুর পর থুতু, খিস্তি, লাথ—উল্লাসে এই যে ছরছর করে মুতে দিচ্ছে গায়—খা, খা, খা, খা—শরীর থেকে যে ছিঁড়ে নিচ্ছে কাপড়—সারারাত এই ঠান্ডায় যে বেঁধে রাখছে তমালগাছে নাঙ্গা—পরিত্যক্ত, ব্যর্থ একটা মানুষের গায়ে কুকুর ঠেলে দিচ্ছে সফল ভিড়—খা, খা, খা, খা—কালো, তুমি এখনও নেমে আসবে না আমার সবটা জুড়ে? ঢেকে দেবে না, মুড়ে দেবে না আমায়? আমি এতই ফালতু আজ?

কালো, তুমি কী? তুমি কি মানুষ?

না, না—না, না—তুমি প্রেম, তুমি মৃত্যু—আর কিছু হতেই পারো না তুমি—তোমার প্রেমে মরব জেনেও তাই আগুনপাখি আমি—তাই ছুটে চলা সব ছেড়ে—আজও—আজও তোমারই পানে— তোমার পায়ে—তোমার পায়ে পড়ি। কালো, সব তো আমারই দোষ—দয়া করো, কালো, ক্ষমা করে দাও—কাছে টেনে নাও—আরও গভীর, আরও গভীর, আরও গভীরে—গিলে নাও এইবার— তোমাতে মুক্ত হই—কালো, তুমিই তো মুক্তি—তুমিই তো সব আলো, সব সেন্স, সব দৃশ্য, স্পৃশ্য, শ্রাব্য, অশ্রাব্যের শেষ—জ্ঞানীরা আজকে চিনেছে ব্ল্যাকহোল—আমি তো সেই কবেই বুঝেছি—কৃষ্ণ—

না—তোমার ওপর ডিপেন্ড করিনি আর—কবে নিজে তুমি আসবে—ভাঙা নৌকোয় তুলে আবার কবে জোর করে নিয়ে চলে যাবে মাঝযমুনায় টেনে—আবার কবে সে ঝড় উঠবে, নৌকো ডুববে—সে আশায় আশায় আশায় প্রতিটি দিন, মুহূর্ত, পলক আর মরতে পারি না আমি—এই আমি ঝাঁপ দিলাম জলে, তলিয়ে যাব, তলিয়ে যাব, শুধু তলিয়ে যাব এবার—হাঁড়িকুড়িকলসি দুধননীদই সোনাদানাসুখ কাপড়চোপড়লজ্জা শরীরমনমায়া সব ত্যাগ করে আগেও গিয়েছি ও গভীরে—প্রেমশেষে ফিরিয়ে দিয়েছ তুমি—আজ আমি একা—প্রেম নেই—তুমি নেই—ফেরার কোনও উপায় রাখিনি আর—মাঝপথে আর ফিরে আসা নেই—শুধু সামনে—শুধু কালো—সব কালো—মিশকালো, বিষকালো—শুধু কালো, শুধু মুক্তি—শুধু ঘোর—গিলে নাও, গহ্বর—চাইলেও যেন চাইতে পারি না আর—শেষ আমি চোখ বুজলাম—এই রইল তোমার রাই—

অন্তে মিল না মৃত্যু, আমি তো জানি না, কালো—তুমি যা দেবে, তাই—


ছোট, বড় সবার।
স্পোর্টস্ ও ক্যানভাসের বিশাল সম্ভার ।
আর দাম, পুরোপুরি সাধ্যের মধ্যেই।
Sreeleathers
KANVAZ
ফ্যাশন দুনিয়ার নতুন প্যাশন
28513
Rs 748/-
Genesis 2878
Sreeleathers
বিশ্বমান। খাঁটি দাম।
Lindsay Street 033 22861510/11 Free School Street (Opp. Fire Brigade) 033 22861506

ইচ্ছে বিরক্তি রাগ, বেফাঁস কিছু কথা

আমাদের পাড়ায় একটি বিখ্যাত রক আছে। গত ছ'শো বছর ধরে এলাকার বিখ্যাত থেকে কুখ্যাত মানুষ ওই রকে আড্ডা মেরে গিয়েছেন। তিরিশ বছর আগে দেখতাম ওই রকে আড্ডা মারার ব্যাপারে একটা নির্দিষ্ট অলিখিত নিয়ম আছে। যেমন, ভোরবেলায় প্রৌঢ়রা হেঁটে স্বাস্থ্য উদ্ধার করে ওই রকে বসে চা খান। সেদিনের কাগজের হেডলাইন নিয়ে যে যাঁর মতামত দেন। রাজনীতিই আলোচনার বিষয় হয়। তাঁরা বাড়ি ফিরে যান আটটা নাগাদ। তখন আসেন বাজার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া মধ্যবয়স্করা। রাজনীতি তো থাকবেই, চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে এঁরা কিউবা বা ভিয়েতনাম বিষয়ক যেসব কথা বলেন তা মুগ্ধ হয়ে শুনতে হয়। অফিসের তাড়া থাকায় ন'টার মধ্যেই তাঁরা রক ছাড়েন। এরপরে রকের দখল চলে যায় সেইসব তরুণ এবং যুবকদের হাতে, যাদের কিছু করার নেই। চাকরি হচ্ছে না, পড়াশোনা শেষ অথবা ওই পাট অকালেই চুকিয়ে দিয়েছে। এরা দু'টো চা তিন কাপে ঢেলে খায়। কিন্তু এদের কণ্ঠস্বর দূর থেকে শুনলে মনে হবে প্রচণ্ড ঝগড়া হচ্ছে। ফুটবল, ক্রিকেট তো বটেই, ইন্ডিয়ান হকি টিম নিয়েও এরা স্বচ্ছন্দে কথা বলে। সিনেমার ব্যাপারে এদের জ্ঞান অগাধ। শুধু সিনেমা কেন, পৃথিবীর যে কোনও বিষয় নিয়ে এরা নিজেদের ভাষায় কথা বলতে পারে। সকালের দু'টো সেশনে যে ভাষা শোনা যায় না তা এখন বেশ সোচ্চার হয়। পাড়ায় কোনও নতুন পরিবার এসেছে এবং সেই পরিবারের কোনও যুবককে দেখলে এদের মন্তব্য, 'শ্যামপাড়ায় নতুন মাল ঢুকল।' আর একজন গম্ভীর গলায় বলল, 'গুরুর চার নম্বরী জেরক্স বলে মনে হচ্ছে।'

গুরু মানে উত্তমকুমার আর চার নম্বর জেরক্স হল তাঁর নকলের নকলের নকল। কারণ তরুণটির চুলের কায়দা খানিকটা উত্তমকুমারের মতো। তবে রকের এমন আকর্ষণ-ক্ষমতা যে ওই তরুণটিকে কিছুদিনের মধ্যে সেখানে হাজিরা দিতে দেখা গেল।

দুপুরটায় রক সুনসান। চায়ের দোকানদার তার ঝাঁপি বন্ধ করার আগে রক ধুয়ে মুছে রাখে। ওই রকে ভবঘুরে বা ভিখিরিকে বসতে দেয় না সে। ভোরবেলায় যেসব বিহারি রাজমিস্ত্রি বা তাদের জোগাড়েরা এখানে জড়ো হয় তাদেরও ওখানে বসা নিষেধ। রকে আবার ভিড় শুরু হয় সাড়ে চারটের পর। পনেরো ষোলো বছরের কিশোররা মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল নিয়ে শালিকের মতো ঝগড়া করে। এরা চা খায় না। ওইসময় চাওয়ালা উনুনে আগুনও জ্বালে না। সন্ধের মুখে কিশোররা ফিরে যায়। আসেন বৃদ্ধরা। হাতে লাঠি, পরনে পরিষ্কার ধুতি-পাঞ্জাবি অথবা শার্ট প্যান্ট।

'কেমন আছো মিত্তির?' 'ভাল নয়। প্রেসার বেড়েছে মনে হচ্ছে।' 'মনে যখন হচ্ছে তখন দেখিয়ে নিচ্ছ না কেন?' 'আরে ভাই দেখিয়ে কী হবে? ছেলেকে লাই দিতেন এতদিন। এখন ছেলের বউকে তোল্লা দিচ্ছেন। প্রতিবাদ করলে তো কুরুক্ষেত্র হবে। তাই মুখ বন্ধ করে আছি। আর মুখ বন্ধ করলে তো প্রেসার বাড়বেই।' 'আচ্ছা, ঝগড়া না করে গিন্নিকে বোঝাও।' 'সারাজীবনে যা পারলাম না শেষবেলায়—! হুঁ! পকেট খালি হয়ে গেলে স্ত্রী বদলে যায়।'

এইসময় দেখা গেল হালদারবাবু আসছেন রংচঙে শার্ট পরে। আশির কাছে বয়স কিন্তু এখনও লাঠি নেননি। হালদারবাবু বিয়ে করেননি এবং মুখ বেশ কাঁচা। রকে এসে বসে তিনি হাসলেন, 'ওহে, আমাকে এক কাপ প্রস্রাব দাও আর কে কে গিলবে জিজ্ঞাসা করো।'

চা-ওয়ালা গম্ভীর হল, 'দাদা, আপনি আবার চা-কে প্রস্রাব বললেন!'

'কি আশ্চর্য! ভুল বলেছি? তাও তো ঘোড়ার প্রস্রাব বলিনি।'

'তা হলে খাওয়ার কী দরকার?'

'যদি তুমি ভুল করে ওটার বদলে চা বানিয়ে দাও। তা ছাড়া প্রস্রাব তো ভাল জিনিস। মোরারজি দেশাই নিয়মিত সেবন করে রোগমুক্ত হয়ে থাকতেন।'

মিত্তির বললেন, 'জামাটা কোত্থেকে কিনলেন হালদারবাবু?'

'কিনিনি। আমার তখন চল্লিশ বছর বয়স। গোয়াতে ছিলাম। সেখানে এক গোয়ানিজ বান্ধবী খুশি হয়ে প্রেজেন্ট করেছিল। সেই থেকে পড়েই ছিল আলমারিতে। আজ ভাবলাম কবে ছবি হয়ে যাব তাই পরেই ফেলি।' হালদারবাবু বললেন।

'অ্যাঁ। ওটার বয়স চল্লিশ বছর? একদম নতুন লাগছে।'

'আমি কিন্তু ওটা পরতেই পারতাম না। বাড়ির সবাই পাগল বলত।'



অমল সরকার খবরের কাগজে চাকরি করতেন। বললেন, 'পাহাড়ী সান্যাল মশাই ওইরকম চকরাবকরা জামা পরতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁকে বেশ মানাত।'

হালদারবাবু এতক্ষণ কথা বলেননি। চা-ওয়ালা চায়ের কাপ ওঁর হাতে তুলে দিলে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, 'অ্যাঁ! ভাস্টলি ইম্প্রুভড।'

এই আড্ডা চলে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত। তারপর আসেন অফিস-ফেরত যুবকরা। তাদের আলোচনার বিষয় বেশ গম্ভীর! ডি'সিকা থেকে সত্যজিৎ, বার্গম্যান থেকে ঋত্বিক, সিনেমার আনাচ-কানাচে ঘোরেন তাঁরা। তারপর নেমে আসেন ফিল্মি কেচ্ছায়। তার সূত্র ধরে পাড়ায় যখন রবীন মজুমদার থাকতেন তখন সন্ধে পেরিয়ে গেলে জহর রায়, ছবি বিশ্বাস, নৃপতি চ্যাটার্জিরা কীভাবে আসা-যাওয়া করতেন তাঁর বাড়িতে সেসব গপ্পো শুরু হয়ে যায়। ওপাশে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়ের বাড়ি। তিনি যখন গলায় উড়নি দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতেন তখন এরা চুপ করে যেত। খানিকবাদে ছুটন্ত রিকশায় কাত হয়ে পড়ে থাকা শরীর দেখে একজন বলে উঠত, 'সাড়ে ন'টা বাজে। যাই।' ঠিক ঘড়ি ধরে মাতালদের নিয়ে রিকশা যেত রকের সামনে দিয়ে। ধীরে ধীরে ওই যাওয়া কমে গিয়ে একসময় বন্ধ হয়ে গেল। উত্তর কলকাতায় আর রিকশায় আউট হওয়া মাতাল দেখা যায় না। মাতাল কমে গেল রাস্তায়। একসময় সিনেমায় মাতালদের নিয়ে ভাঁড়ামির চল ছিল। সিনেমা থেকে তারাও উধাও।

রাত দশটা নাগাদ বাজার করে বাড়ি ফিরতেন হরিপদবাবু। রকের শেষ ক'জন দেখল উমেশ মাস্টার বিপরীত দিক থেকে আসছেন ছাত্র পড়িয়ে।

'ও হরিপদ, বাজার করে ফিরছ?'

'ওই, শেষ সময়ে যা পাওয়া যায়।'

'মাছ পেয়েছ?'

'সরপুঁটি। সস্তায় পেয়ে গেলাম। দোকান বন্ধ করছিল তো!'

'হবে না কি এক হাত!'

'এখন?'

'আরে এখনই তো সময়। ওহে, দিয়ে যাও।' শেষ কথাগুলো চা-ওয়ালার উদ্দেশে। সঙ্গে সঙ্গে চা-ওয়ালা রকের একপাশে দাবার বোর্ড পেতে গুটির বাক্স ওপরে রেখে দিল। রকে উঠে



বসে উমেশবাবু বললেন, 'তুমি সাদাই নাও হে।'

রকে বাবু হয়ে বসে বাজারের ব্যাগ দেওয়াল ঘেঁষে রেখে হরিপদবাবু বললেন 'এক হাতের বেশি নয় কিন্তু।'

দু'জনে গুটি সাজিয়ে গালে হাত দিয়ে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। একসময় রকের আড্ডাবাজরা বাড়ি ফিরে গিয়েছে, চা-ওয়ালা ঝাঁপ বন্ধ করেছে। কিন্তু খেলা ভাঙেনি। নকশাল আন্দোলনের সময় আমাদের এই পাড়ায় সন্ধের পর লোকজনকে পথে দেখা যেত না। পুলিশের জিপের আওয়াজ আর পাইপগানের শব্দ কমাতে লোকে জানলা দরজা বন্ধ রাখত। শ্যামপুকুর থানার বড়বাবু তাঁর জিপে বসে রাত বারোটায় টহল দেওয়ার সময় দূর থেকে দেখতে পেতেন দু'টো মানুষ রকের ওপর পরস্পরের দিকে ঝুঁকে রয়েছে। নির্ঘাত বোমা বাঁধছে ব্যাটারা। রিভলভার উঁচিয়ে দ্রুত জিপ ছুটিয়ে কাছে এসে দৃশ্যটি দেখে হেসে ফেলতেন, 'দাদুরা, বাড়ি যান'।

খেলায় মগ্ন মানুষ দু'টোর একজন উত্তর দিতেন, 'যাই ভাই'।

রাত দু'টোয় নতুন করে গুটি সাজাতে গিয়ে থমকে যান উমেশবাবু, 'এঃ, বিশ্রি গন্ধ ভেসে আসছে। টের পাচ্ছ হরিপদ?'

'হ্যাঁ। কিছু পচেছে। তাড়াতাড়ি করো, এটাই শেষ দান।'

'কিন্তু গন্ধটা—? ও হরিপদ, মনে হচ্ছে তোমার ব্যাগ থেকে বেরুচ্ছে। দ্যাখো তো।'

হরিপদবাবু চমকে ব্যাগ টেনে নিয়ে ঈষৎ ফাঁক করে তার ভেতর থেকে মাছের ব্যাগ বের করে নাকের সামনে ধরলেন, 'যাঃ। পচে গিয়েছে।'

'সরপুঁটিগুলো পচে গেল? কেনার সময় দ্যাখেননি? নিশ্চয়ই তখনই পেট নরম ছিল। ভাগ্যিস তোমার গিন্নি রান্না করেননি। তা হলে কাল সকালে বিজয় ডাক্তারকে কল দিতে হত। ওই জন্যেই বলে, ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যেই করেন। ব্যাগটাকে ওপাশে সরিয়ে দাও। যাওয়ার সময় পচা মাছগুলোকে ডাস্টবিনে ফেলে যেও।' উমেশবাবু বললেন।

ভোরের একটু আগে দু'জনে বাড়ি ফিরলেন। চায়ের দোকান বন্ধ থাকায় উমেশবাবু দাবার বোর্ড গুটি সঙ্গে নিলেন। কিন্তু হরিপদবাবু মাছের ব্যাগটাকে খুঁজে পেলেন না। রকের ওপাশে সরিয়ে রেখেছিলেন। নিশ্চয়ই কুকুর বেড়াল অথবা বিরাট ছুঁচোর কেউ নিয়ে গিয়েছে সন্তর্পণে।

এই দু'টো মানুষ যখন সেই ভোরে বাড়ির কড়া নাড়তেন অথবা বেলের বোতাম টিপতেন তখন বাড়িতে কী প্রতিক্রিয়া হত জানি না, কিন্তু ইদানীং কাজেকর্মে মধ্যরাতে বাড়ি ফেরার সময় দেখছি রক জুড়ে ঘুমাচ্ছে বিহারি মিস্ত্রিরা। হরিপদবাবু গত হওয়ার পর উমেশবাবু আর সন্ধের পর বাড়ির বাইরে বের হননা।

জলপাইগুড়ির কোনও বাড়ির সামনে রক ছিল না। রকবাজ শব্দটা আমার কানে এসেছিল খবরের কাগজের দৌলতে। রকবাজরা অত্যন্ত অসভ্য, বর্বর, ইতর রসিকতায় অভ্যস্ত যুবক বলেই জানতাম। কলকাতায় আসার পর সেই ভুল ভেঙেছিল। ক্রমশ লক্ষ করলাম কলকাতায় যেসব অঞ্চল নতুন তৈরি হচ্ছে অথবা যেসব অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত ধনীরা বাস করেন সেসব অঞ্চলে কোনও রক নেই। ওই বাগবাজার থেকে বউবাজার, আর ভবানীপুর এলাকায় রক বিপুল পরিমাণে রয়েছে। বালিগঞ্জ নিউ আলিপুর এবং পরে সল্টলেকে রক খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কেন মধ্যবিত্ত প্রাচীন পাড়ায় এদের অবস্থান? কেন টালিগঞ্জের জবরদখল কলোনির নিম্নবিত্ত মানুষেরা রকের প্রয়োজন অনুভব করেননি?

যখন স্কটিশে প্রথম বর্ষের ছাত্র, মফস্বলের গন্ধ ছাড়তে পারিনি, তখন যে ছেলেটির সঙ্গে মোটামুটি বন্ধুত্ব হয়, সে থাকত শোভাবাজারে। সুশীল আমাকে হেদো, কলেজ স্কোয়ার দেখিয়েছিল। সেখানে বেঞ্চিতে বসে আড্ডা মারলে কেউ আপত্তি করত না। সুশীল ছিল আদ্যপ্রান্ত ঘটি। লুচি বলত না, বলত আজ বাড়ি ময়দা। দিলুম, খেলুম, বললুম ওর মুখে শুনতে খুব ভাল লাগত। তা ওই সুশীল পরপর তিনদিন কলেজে না আসায় আমি চিন্তিত হলাম। কলেজের অফিস থেকে ওর ঠিকানা জোগাড় করে শোভাবাজারে গেলাম। তখন দুপুর একটা। রাস্তাটা নির্জন। বাড়ির নম্বর মিলে গেলে দেখলাম সুশীলদের বাড়ি বেশ বড়সড়। সামনের দরজা বন্ধ। দু'বার কড়া নাড়লাম, কেউ জানান দিল না। সেসময় রাস্তা দিয়ে দ্রুত হেঁটে যাওয়া এক শীর্ণা মহিলা কথা ছুড়ে দিয়ে গেলেন, 'খিড়কির দরজায় যান।'

এবার সেটা নজরে এল। বাড়ির গায়ে টিনের দরজা। ঠেলতেই সেটা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে ডাকলাম, 'সুশীল'। সাড়া পেলাম না। আরও একটু এগোতে দেওয়াল দেখলাম। তার পাশ দিয়ে উঁকি মারতেই চমকে উঠলাম। তিনজন মহিলা, বিভিন্ন বয়সের, গামছা পরে উঠোনে কোনও কাজ করছেন। 'কে? কে ওখানে উঁকি মারে? কে?' একজন চেঁচিয়ে উঠলেন।

নিজেকে আড়ালে রেখে বললাম, 'আজ্ঞে, আমি। সুশীলের বন্ধু।'

'সুশীলের বন্ধু? উঁকি মারছ কেন?'

'আজ্ঞে, আমি বুঝতে পারিনি।'

'বাইরের রকে গিয়ে বসো।'

দ্রুত বাইরে চলে এলাম। রক? বাইরে রক আছে? দেখলাম বাড়ির ওপাশে হাত আটেক লম্বা, আড়াই ফুট চওড়া জায়গাটা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে রাখা আছে। আমি সেখানে বসার পাঁচ মিনিট পরে সুশীল এল। দেখেই বুঝলাম ওর শরীর খারাপ। বলল, 'দু'দিন খুব জ্বরে ভুগলুম। আজ জ্বর নেই। তুমি আসবে ভাবতেই পারিনি।'

'তিনদিন কলেজে যাওনি বলে দেখতে এসেছিলাম।'

'ভাল করেছ। কিন্তু এখন যে তোমাকে চা খাওয়াব তার উপায় নেই। জগাদার চায়ের দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চারটের সময় খুলবে।'

'জগাদা—?'

'ওই তো। এ পাড়ার সব বাড়িতে ওর দোকান থেকে চা যায়। রকে সাপ্লাই দেয়।'

এই ব্যাপারটা মফস্বলের লোক ভাবতেই পারে না। দু'চারটে কথা হল। বললাম, 'আমি না জেনে ভেতরে ঢুকে পড়েছিলাম, ওঁরা যে ওখানে থাকবেন বুঝতে পারিনি।'

'হ্যাঁ। এখন চানের সময় তো। মা জ্যেঠি কাকিরা ধোয়া-মোছা কাচাকাচি গামছা পরে সেরে চান করতে যান। এই বাড়িতে আমরা অনেক মানুষ থাকি। ভাগে এক দু'টোর বেশি ঘর নেই। কেউ এলে তাই ভেতরে নিয়ে যেতে পারি না। রকেই বসি। বাবা কাকাদের গেস্টরাও এখানে বসেন। খোলা জায়গা তো, গরম লাগে না।' সুশীল বলেছিল।

তখন পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত বেঁচে ছিলেন। তাঁর একবার ইচ্ছে হল বাৎসরিক রক সম্মেলন করার। ষাট সত্তর বছর আগে যাঁরা ওই রকে আড্ডা মারতেন অথচ পাড়ায় নেই, তাঁদেরও খবর দেওয়া হল আসার জন্যে। বর্তমান রকবাজরা প্রাক্তনদের আপ্যায়ন করলেন সকাল দশটায়। রকের প্রাক্তন সদস্য সংগীতশিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ঢুঁ মেরে গেলেন। এক ভদ্রলোক নামলেন গাড়ি থেকে। বর্তমান সদস্যদের একজন তাঁকে ধরে নিয়ে এলে তিনি বললেন, 'আমি রকে বসব।' বয়স অবশ্যই নব্বুই-এর ওপরে, পরনে থ্রি পিস স্যুট। হাতে তামাকহীন পাইপ। আমার দিকে তাকিয়ে জুত করে বসে বললেন, 'ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন থার্টিএইট, আমি প্রথম এই রকের মেম্বার হই। তখন সুভাষ বোস, গান্ধীজি বেঁচে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়নি। তা দেখছি রকটা একইরকম আছে।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কেমন আছেন এখন।'

বৃদ্ধ একদুই সেকেন্ড ভাবলেন, 'আমি যতক্ষণ নস্টালজিক না হই ততক্ষণ ভাল থাকি। অতীত মানুষকে খুব কষ্ট দেয়।' রকের ওপর দু'বার হাত রেখে বললেন 'এটা আমার অতীত।'

এক-একটা সময় আসে যখন নিজেকে ভাল লাগে না। বাইরের কারণে নয়। নিজেরই কারণে নিজেকে খারাপ লাগে। কী সেই কারণ? একটা? দু'টো? না তার বেশি? আসলে একটা বড় ভুল করলে তার চেন-রিঅ্যাকশনে আরও ছোট ছোট ঘটনা ঘটতে থাকে। তাতে কি মনে হয় কেন এটা করলাম? তার থেকে নিজেকে খারাপ লাগা শুরু? না কি কোনও কারণে অন্যের কাছে যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছি না বলে, শেষে ক্ষোভটা ঘুরে নিজের দিকে আসছে? মনে হচ্ছে, আমার অস্তিত্বের কী মানে! কেন চিনাংশুক মজুমদার বা বৈকুণ্ঠ সমাজপতি কিংবা মণিমালিনী মিত্র তেমন ইমপর্ট্যান্স দিলেন না আমাকে!

অন্যের ওপরে যে-রাগটা জন্মাল তা যখন নিজের দিকে ফেরে তখন এমন হয়ে থাকে নিশ্চয়ই। অন্য সঙ্গীসাথীদের মুখে এ-কথা শুনেছি কতবার। আরও কতবার ঘরে বসে নিজের প্রসঙ্গেই এ-কথা নিজের মনে হয়েছে।

কিন্তু সে-সব কম বয়সের কথা। কত কম? উঁহু, খুব কমও নয়। নিজের পিছনে তাকিয়ে দেখি ৪৫ বছর বয়স যখন চলছে, তখনও এমন কথা মনে হয়েছে বটে আমার। ৪৪ বছর ৮ মাস বয়স পর্যন্ত, ঠিক-ঠিক বলছি এবার। মনে একটা ডায়রি থাকে সেটা বাইরের লোকের সামনে আনা যায় না। একলা, ঘরে বসে, ব্যাক ক্যালকুলেশন করলে মনে পড়ে।

কিন্তু বাইরের লোক কী বলল, এটা নিয়ে ধরে বসে থাকলে শেষ পর্যন্ত মনের কথা বলার সংকল্প আর থাকে না। যেটা আগে কয়েকবার বলেছি, এখানে আরেকবার বলি—পরেও নিশ্চয় অন্য লেখায় বলব, বলেই যাব, তা হল, মনের কথা বলবে বলেই একজন মানুষ লিখতে আসে। আর অন্য কারণগুলো বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গৌণ হয়ে যায়।

অন্য কারণগুলো কী! এক, আমার লেখা ছাপা হবে তো? দুই, ছাপা হলেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় হবে তো? হলে, লোকে পড়বে তো? এবং পড়ে যথেষ্ট ভাল বলবে তো!

কিন্তু, একটা সময় এগুলোর তত গুরুত্ব থাকে না। সংসার যেমন চলে গেলেই হল, একটু টেনেটুনে হলেও, জীবনযাপন যদি মোটামুটি স্বাভাবিক ভাবে করা যায়, তাতেই অনেক মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারে। সেইরকম কয়েকজন পাঠক থাকলেই একজন মনে করতে পারে, আচ্ছা, আমি যা যা বলছি কেউ কেউ তো সেটা শুনছে—কখনও বলছে, এটা ঠিকই বলেছ, কখনও বলছে, না এটা তো আমি মানি না। আমরা আলাদা-আলাদা। এই হল আমার মত। এসো তর্ক করি। এইরকম দু-পাঁচজন থাকলেই চলে যায় কোনও কোনও লেখকের। তখন তার দোষত্রুটি দেখানোর আপনজন হয়ে দাঁড়ায় সেই ক'জন পাঠক। তার মন বোঝার আত্মীয়ও হয় তারা। ফলে, আর যে দশজন বা পঞ্চাশজন জিনিসটার বিরোধিতা করছে তাদের ভাল মনেই মেনে নেওয়া যায়। যেমন সারাদিনের পরে, তুমি কাজের শেষে ফিরে গেলে একটা মাথা গোঁজার আশ্রয়ে। সেই আশ্রয় যদি সাতমহলা বাড়ি না-ই হয়, যদি হয় দু-কামরা তিন কামরার ফ্ল্যাট এমনকী ভাড়া-করা বাসা, তাতেও তোমার আশ্রয়ে ফেরার বোধটা তো হয়। মনে তো হয় না, রাস্তায় রাত কাটাচ্ছি। পাঠক সম্পর্কেও এমন মনোভাব বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জন্মাতে পারে। দু-চারজন তো পড়ল। সেই যথেষ্ট।

এরপরে আসে সেই কথাটা। যে পড়ছে, তাকে আমি কী দিতে পারছি। ঠিক ঠিক দিতে পারছি নিজের মনটাকে? সেই প্রশ্ন থেকেই নিজেকে খারাপ লাগতে শুরু করে।

বিনয়বশত এ-কথা অনেকের মতো আমিও বলেছি, কী আর লিখতে পারি! কিন্তু বিনয়ের মধ্যে একটা ভান থাকে। আমি যে নম্র, নত, এইটা দেখানোর ভান। যেমন কবিতার মধ্যে অনেক সময় অভিনয় থাকে। অনেকদিন ধরে যে মন দিয়ে কবিতা পড়ে চলছে—সে ধরতে পারে, এখানে যে-কথাটা বলা হচ্ছে, সেটা একটা অভিনয় করে দেখানো। 'কবিতায় নাট্য' বলে যে বিখ্যাত কথাটা জীবনানন্দ দাশ বলেছেন। অনেক কবির লেখাতেই নাট্যশিল্পের অত্যন্ত কুশলী বা মর্মছোঁয়া যে-সব প্রয়োগ থাকে—একটি শিল্প অপর শিল্প থেকে গ্রহণ করে সমৃদ্ধ হয়—এটা সেইরকম কিছু নয়। এটা হল সেরকম কথা, কবিতার মধ্যে বললে লোকের কাছে যা ভাল শোনাবে, তেমনভাবেই কথা বলা। কখনও নরম নির্জন একাকী ধরন নিয়ে বলা, কখনও কঠিন কঠোর ক্রুদ্ধভাবে বলা—দু'টো ক্ষেত্রেই কিন্তু ঠিক-ঠিক আমার মনের যে অনুভবটা হচ্ছে, সেইটাকে ঢাকা দিয়ে রাখা হল। এইভাবে, একবার ঢাকা দিয়ে রাখার অভ্যাস হয়ে গেলে, মূল কথাটাকে খোঁজার চেষ্টাটাই চলে যায়। অনেকটা ওপর থেকে, সারফেস থেকে, কথা বলা অভ্যাস হয়ে যায় তখন।

কিন্তু সেটা সম্পর্কে সতর্ক থাকলে, মনে মনে যুদ্ধ করে সেই প্রবণতাকে মনের মধ্যে ঢুকতে না-দিলে, গভীরতর ব্যর্থতার দেখা পাওয়া যায়। কেমন সেই ব্যর্থতা?

আসল ঘটনাগুলো বলতে অনেক সময় লাগবে, খুব ছোট্ট দু-একটি উদাহরণ দিই। গত সপ্তাহেই যেমন মুম্বই শহরের একটি ঘরে ছিলাম কয়েকদিন—তার একটা দিক পুরো জানলা। কোনও গরাদ নেই—খোলা। রাতে, সমুদ্রের হাওয়া ঢুকে পড়ে বলে একটা চিক বা ঝালর নামিয়ে দেওয়া হয়। কবি মন্দার মুখোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছিলাম তার ১৩/১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সে তার চিত্রকর পিতার আঁকার ঘরে ঘোরাঘুরি করত, এবং সে ঘরের একটা দিক ছিল পুরো জানালা—কোনও গরাদের কথা সে বলেনি আমাকে। সেই জানলা দিয়ে গঙ্গা দেখা যেত। তার মুখ থেকে শোনা ঘরটি আমার মনের মধ্যে সেই যে ঢুকে পড়ল—আর গেল না। তাও বারো-তেরো বছর তো হবেই, এ গল্প শুনেছি।

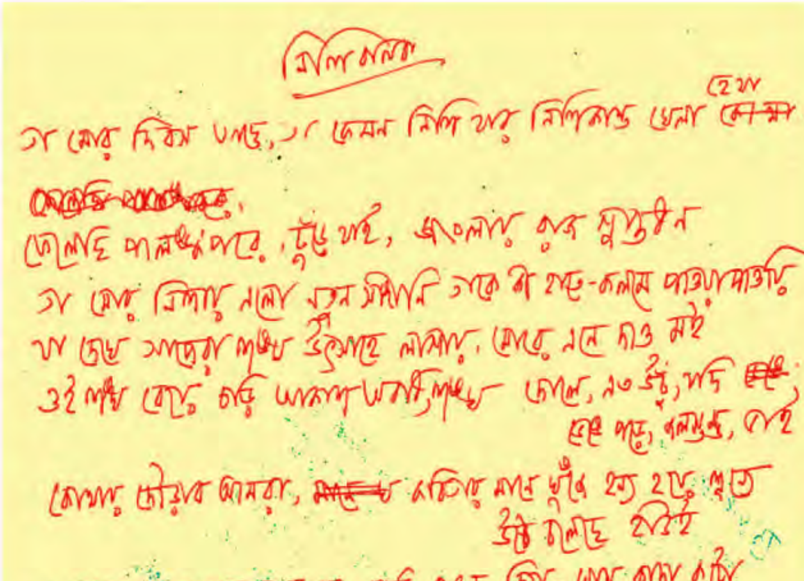
এই মুম্বইয়ে কয়েকদিন থাকার ঘরটি দেখামাত্র আমার মন্দারের বাবার ওই না-দেখা-ঘর মনে পড়ল—যার কোনও গরাদ নেই এবং যা থেকে গঙ্গা দেখা যায়। পাঠক বুঝতেই পারছেন, গল্পসূত্রে শোনা ওই ঘরটি এই বারো-তেরো বছরে আমার মন, অনেকটা নিজের মতো করে বানিয়ে নিতে থেকেছে। সে-ঘরের মধ্যে একজন চিত্রকর থাকেন, এবং তার দেয়ালে মেঝেতে সমাপ্ত-অসমাপ্ত ছবি, রং, ব্রাশ, ইজেল, ক্যানভাস। এর সমস্তটাই আমার একবারও না-দেখা। অন্যদিকে, এই যে ঘরে এখন রইলাম, তার ওই দেওয়াল-জোড়া জানলা দিয়ে গঙ্গা দেখা যায় না। সমুদ্রও না। দেখা যায় একটি বড় গির্জা। তার পাশে পাশে, ওইরকম পুরনো স্ট্রাকচারের দু-তিনটি বাড়ি—যে বাড়িগুলোয় গির্জার সঙ্গে নানা কাজকর্মে যুক্ত নারী-পুরুষরাই থাকেন। রাতে যখন শুয়ে পড়ি বিছানায়, জানলা দিয়ে অত বড় গির্জা আর দেখা যায় না—শূন্যে ভেসে থাকে তার চূড়ার ক্রসচিহ্ন। সোনালি-লাল-হলদে মেশা একটা আলো-জ্বলা ক্রস।

খুব উজ্জ্বল বা ঝকঝকে নয়। নরম আলো। নীলচে-কালো মেশা রাত্রি-আকাশে ওই ক্রস ভাসতেই থাকে সারারাত, কেননা, গির্জার মাথাটা আমি দেখতে পাচ্ছি না তো।

নতুন জায়গা। তার ওপর সারাদিন থেকে থেকে কালো কফি খাওয়া হয়েছে। ঘুম গাঢ় হয় না। একদিন দেখি, গির্জার গায়ে ভারা বাঁধা হয়েছে, অ্যাপ্রন-পরা একজন দীর্ঘকায় পুরুষ, ভারার ওপর উঠে গির্জার গায়ে কিছু আঁকছেন। আমি এই জানলায় দাঁড়িয়ে। আমার পাশে এখানকার কয়েকজন তরুণ-তরুণী। আমি তাদের বলছি, ওই যে পেন্টার—ওঁর মেয়েকে আমি চিনি। ওই উঁচু গির্জার কাঁধের কাছে দাঁড়ানো অ্যাপ্রন-পরা পুরুষটিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি পিছন থেকে।

এইটুকুই। ভোর পাঁচটায় চার্চের প্রার্থনা শুরু হয়েছে। তার বেলের আওয়াজে ঘুম ভেঙেছে। গাছে-গাছে অজস্র পাখির আওয়াজ। আমি বিছানায় উঠে বসে ভাবছি, এটা কী দেখলাম?

এটা তো স্বপ্ন। সবাই বুঝল। যা স্বপ্ন নয় তাই বলি এবার। যেদিন চলে আসব, তার আগের দিন, তাড়াতাড়ি ফিরেছি।



সন্ধেবেলা এই ছেলেমেয়েরা কয়েকজনকে ডেকেছে। বন্ধুরা এলে আপনাকে ডাকব, একটু রেস্ট করে নিন, বলে তারা চলে যেতে, জানলার ধারে একটা চেয়ারে বসেছি—অমনি একটা ম্যাজিক হল বাইরে।

একটা আলো, ওই বড় গির্জার কাঁধে-মাথায়, আর পুরনো স্ট্রাকচারের বাড়িগুলোর মুখ-মাথা ছুঁয়ে আছে। সাদা রঙের বাড়িগুলো থেকে ছিটকে যে-আলো পড়েছে উঁচু-উঁচু নারকেল গাছগুলোর ঝালর-দোলা পাতায়। সন্ধে প্রায় ছ'টা তখন। আশ্চর্য, এই শেষ বিকেলে, কোথাও একজনও মানুষ দেখা যাচ্ছে না জানলা থেকে। চার্চের বিরাট ঢালু চাতালেও কেউ নেই। শুধু অদ্ভুত একটা আলো। কী তার রং? না সূর্যাস্ত-রং নয়। ওই জানলা ওই গির্জা ওই উঁচু-উঁচু গাছ, ওই কয়েক মিনিটের জন্য জনহীন প্রশস্ত ক্যাথিড্রাল চত্বর, পুরাতন গৃহসারি, তাদের মাথা-মুখ ছুঁয়ে চার্চ ক্রস পর্যন্ত পৌঁছনো ওই আলো—ওই আলোর নাম কী আমি জানি না। পাবলো নেরুদা তাঁর 'পোয়েট্রি' নামক কবিতায় বলেছিলেন : অ্যান্ড ইট ওয়জ দ্যাট এজ...পোয়েট্রি অ্যারাইভড/ইন সার্চ অফ মি। বলেছিলেন, আই ডিড নট নো হোয়াট টু সে, মাই মাউথ/হ্যাড নো ওয়ে/উইথ নেম্‌স...।

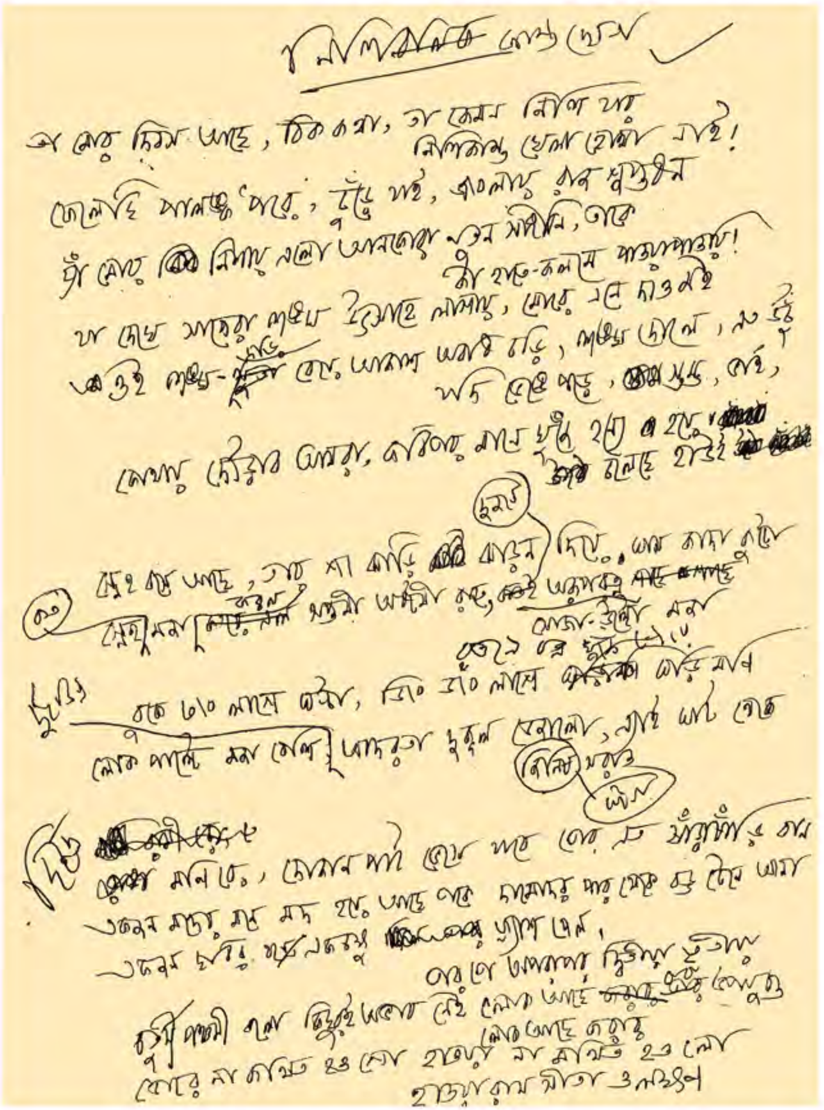
এ কয়েকদিন এখানে আছি, একদিনও ঠিক এই সময়টায় কেন জানলার ধারে এসে বসলাম না! কাজে ছিলাম সবাই। অবসর ছিল না। এখন, এই যে আলো—এর নাম কী দেব? হিন্দি ছবিতে অনেক কাল আগে 'চিত্রগুপ্ত' নামে একজন গান লিখতেন। তিনি লিখেছিলেন মুকেশের গাওয়া একটি গানে : অপনে তো আঁখ এক হি হ্যায়—উনকে হাজার হ্যায়। ইয়ে

কৌন চিত্রকার হ্যায়, ইয়ে কৌন চিত্রকার। আর আমাদের শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর একটি জঙ্গলের কবিতায় লিখেছিলেন : 'পাতার সহস্রতম চোখ!' কোন চোখ দিয়ে দেখতে হবে এই আলো? এইসব বাড়িঘর গাছ গির্জা আসল নয়—এরা আঁকা! অন্তত এখন কয়েক মিনিটের জন্য এরা আঁকাই। কোনও সন্দেহ নেই।

সে কয়েক মিনিট দ্রুত পার হয়ে গেল। পুরো 'সন্ধে নামার আগে' ওরা আমার নাম ধরে ডেকে নিয়ে গেল। আর কোনওদিন সন্ধের কয়েক মিনিট আগে বসতি নির্জন হয়ে গিয়ে ওইরকম আলো পড়বে আর আমি দেখার সুযোগ পাব—এ আশা রাখি না।

আমাদের যাদবপুরের বাসায় আসে একটি মেয়ে। সে দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করে একটি টেলিভিশন চ্যানেলে। কখনও চাকরি বদলে অন্য চ্যানেলে চলে যায়। কিন্তু তার সঙ্গে মিশলে নানা জিনিস জানা যায়। কোথায় কোন দূর গ্রামে বাউল-ফকিরদের আখড়ায় গিয়ে ক'দিন কাটিয়ে এল। হেঁটে আজমীর শরিফ যাবে ফকিরদের দলে মিশে—তাই চাকরি-ই ছেড়ে দিল। যেমন সে ঘুরে বেড়ায় ভারতবর্ষের বিগ সিটিগুলোতে, তেমনই একেবারে নাম-না-জানা গাঁ-গঞ্জে। খুব গর্ব করে বলে সে, তিরিশ পার হয়ে একত্রিশে পড়ল।

উল্টোদিকে, আমার তো আছে বলতে একটাই জিনিস : ওই



ছেলেবেলার রানাঘাট। সেই গল্পই করি। আমার যখন ১৬/১৭ বছর বয়স, একবার কয়েক দিনের তুমুল বৃষ্টির পর সকালে উঠে দেখি, ঝড়-বৃষ্টির দাপটে বাড়ির পিছনের পাঁচিল ভেঙে গিয়েছে। তুলসী মণ্ডপ অর্ধেক ডুবে গিয়েছে বৃষ্টিতে বিরাট হয়ে যাওয়া পিছনের পুকুরের জলে। উঠোনে উঠে এসেছে পুকুর। এ-সব গল্প শুনে সে মাঝে মাঝে বলে, আমাকে একদিন নিয়ে যাবেন। প্ল্যান হয়। আমি, বুকুন আর ও—তিনজনে যাব একটা বর্ষাকালে। প্ল্যান পর্যন্তই। বর্ষাটির্ষা নিজের মতো এসে চলে যায়। মেয়েটিও ব্যস্ত হয়ে পড়ে তার কাজে। আমাদের বাড়ি আসা কমে যায় তার। একদিন স্বপ্ন দেখি, আকাশ ধোঁয়ার মতো, কতদিন রোদ ওঠেনি ঠিক নেই—গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। আমাদের বাড়ির পাঁচিলটা যে আগের রাত্রেই পড়ে গিয়েছে পিছনের পুকুরজলে এই ভোরে আবিষ্কার হল। ভোরে, বারান্দার দরজা খুলে দেখছি কতটা জল, চোখের সামনের ওই পাঁচিল-বাধা না-থাকায় অনেক দূর চোখ চলে যাচ্ছে। ওই পুকুরের ওপারের কুলগাছটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে—সেই কুলগাছের হাঁটুও জলে ডুবে আছে।

সব ঠিক ঠিকই আছে—আগে যা যা ছিল। শুধু আমাদের জলভর্তি উঠোনে দাঁড়িয়ে সেই মেয়েটি। সে একটা জিন্স পরায় তাকে লম্বা লাগছে, আর কালো একটা টি-শার্ট। মাথায় তার স্বভাবমতো কালো ফেট্টি বা রুমাল জাতীয় কিছু বেঁধেছে। আমি কিন্তু সেই পাজামা-শার্ট পরা ষোলো বছরের কিশোর। দাড়ি ওঠেনি। চশমা নেই। ছাতা ছাড়া বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকতে ভয় পাচ্ছি না। আর বলছি, বলেছিলাম না, এখন বুঝতে পারছ তো—সে অবাক হয়ে সব দেখছে, আর বলছে, হ্যাঁ, তাই তো। কিন্তু বই-খাতাও তো সব ভিজে গিয়েছে ঘরে জল ঢুকে। সামনে তো পরীক্ষা। কী হবে? সত্যিই তো! আমার তখন তো সামনে পরীক্ষা বটেই।

মেয়েটি আমার চেয়ে ২৫ বছরেরও বেশি ছোট আসলে—তখন কিন্তু সে ৩১ বছরের মহিলা। আমি ষোলো বছরের ইলেভেনে পড়া ছেলে।

ঘুম ভাঙার পর বসে আছি জানলার ধারে আমার সরু খাটে। যাদবপুর তখনও ভাল করে জাগেনি। পাখিরা শুধু উড়ছে জানলার আকাশে। ভাবছি—এটা কী দেখলাম? সময়টা এতটা এদিক-ওদিক হয়ে গিয়েছে।

আমার চেয়ে ২৫ বছরের ছোট মেয়েটা আমার চেয়ে অত বড় হয়ে গেল! আমার কি ওকে দিদি ডাকা উচিত ছিল স্বপ্নে? তা-ই ডেকেছি কি? ওই স্বপ্নের ভিতর একেবারে আজকের দিনের পোশাক পরে ওই মেয়ে কী করে ওর জন্মের দশ বছর আগে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল? কী করে দাঁড়াল ওর জন্মেরও আগের বৃষ্টিতে—বন্যার কিনারে?

হ্যাঁ সেই দিন থেকেই, সে-বছর, বন্যা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

দু'টি স্বপ্ন বললাম। একটি আলো বললাম। এবার একটি দূরত্ব বলি। একবছর হয়নি এখনও। প্লেনের উইন্ডো সিট পেয়েছি। বিমান আকাশে উঠে এসেছে, তাও দেড় ঘণ্টা তো হয়েই গেল। নীচে তাকিয়ে এখন আর কিছুই দেখা যায় না। জানলার ধারে কখনও ভাসমান মেঘ। কখনও কিছুই না। দূরে নীল। হঠাৎ দেখি সেই নীলের মধ্যে সাদা এক রেখা চলেছে। লক্ষ করলে বোঝা যায়, সেই রেখার সামনে একটি প্লেন! ছোট্ট দেখাচ্ছে এই জানলা থেকে।

শুধু অনেকখানি দূরে নয়। অনেকটা ওপরেও আমার এই জানলা থেকে। কী দ্রুত যে এগিয়ে যাচ্ছে আরও অনেক দূরের দিকে—পিছনের লম্বা সাদা রেখাটি আসলে ছেড়ে যাওয়া ধোঁয়া। দেখতে দেখতে, সেই ছোট্ট, চোখে-প্রায়-না-পড়া-প্লেন, নীলের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

এইবার, কেমন ভয় করে উঠল আমার। তার মানে আকাশটা কতখানি বড়? কী বোকার মতো ভাবনা! আকাশ যে সীমাহীন, তা কি ছোটবেলা থেকেই আমরা জানি না। তা ছাড়া স্টিফেন হকিং-টকিং এ-সব তো এখন সবাই জানে। ইউনিভার্স ব্যাপারটা যে কী, তা তো টিভিতেও কত সময় বলে। কতরকম ছবি দেখায়। কথায়-কথায় কি মানুষ বলে না, অনন্ত আকাশ!

কিন্তু, এমন প্রত্যক্ষভাবে যেন কখনও বুঝিনি। ৩৭ হাজার ফুট ওপরে তখন বিমান, ৩৭ হাজার ফুট তো কিছুই নয়, সে আর উচ্চতা হিসেবে কী এমন! কিন্তু, ওইরকম শূন্যে চলতে চলতে, আরও উঁচু শূন্যে, আরও ঘন নীলের মধ্যে দ্রুত কোনও বস্তুকে মিলিয়ে যেতে দেখে একটা কাঁপুনি লাগল। যেন আকাশ ব্যাপারটার মধ্যে দূরত্ব জিনিসটা কী বিরাট তার একটা ধারণা জন্মাল। খুউব বড় কোনও কিছুর সংস্পর্শে এলে, তার অনুমান করতে পারলে যেমন লাগে, তেমন একটা ভয় লাগল।

তারপর মনটা কেমন একদম ফাঁকা হয়ে গেল। এয়ারপোর্টে নামার পর লোক এসেছে নিতে। কিন্তু তাদের সঙ্গেও আমি আড়ষ্ট, অস্বাভাবিক। ভাগ্যিস তারা আমায় আগে দ্যাখেনি বলে ভাবছে, আমি সত্যিই বোধহয় অত কম কথা বলি। তারপর থেকে এখনও, যখনই একলা হয়ে ভাবি, ওই দূরতম নীলের মধ্যে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া সাদা ধোঁয়ার রেখাটিকে—মন একেবারে অবশ হয়ে যায়। মনে হয়, সে কত অসম্ভব দূর! ধারণার অতীত একটা দূর!

এই যে দু'টো স্বপ্ন বললাম, একটা দূরত্ব বললাম। বললাম একটা আলো—এদের সবার সামনে দাঁড়িয়ে সে-মুহূর্তে কেবল মোহিত হয়ে গিয়েছি। সম্বিত ফিরবার পর থেকেই ভেবেছি, এখনও ভাবি, এরাই তো কবিতার অন্তঃসার। কবিতার ভ্রূণ। এবার এদের প্রকাশ করব কী করে? উপযুক্ত শরীর চাই তো এদের, অর্থাৎ উপযুক্ত ভাষা চাই তো? ওই যে গির্জা বাড়ির গায়ে গায়ে কয়েক মিনিটের আলো! ওই যে স্বপ্নরা, যাদের দেখে ঘুম ভেঙে বিছানায় বসেছিলাম ভোরে। কী ভাবছিলাম? ভাবছিলাম, কী করে এদের বলব। এখন যেভাবে বললাম, সেভাবে নয়। এ তো মুখে বলার মতো। কাউকে গল্প করার মতো। কিন্তু, তখন মনটা যেমন হয়ে গিয়েছিল, ওই দূরত্বেরও দূর দেখার পর যে ব্রহ্মাণ্ডের আন্দাজ এসেছিল—আমার মনের ভিতরটা ঠিক কীরকম হয়েছিল তখন—সেইটা বলার জন্য কবিতার দরকার। আর কবিতার জন্য দরকার তার উপযুক্ত ভাষা। কীভাবে পাব তাকে? এক-একটা অভিজ্ঞতার জন্য একেক রকম ভাষা চাই। কারণ, ওই আলো যখন পড়ল গির্জায়, আর বিমান যখন ভেদ করছে নীল তার ধোঁয়ার রেখা টেনে—তখন তো আমার মন দু'টি ভিন্ন রকম অবস্থায় গিয়ে পড়েছিল। সেইসব অবস্থার স্মৃতি আছে এখনও। ওই যে দু'টি স্বপ্ন—তারা তো একইরকম প্রতিক্রিয়া ঘটায়নি আমার ভিতরে। ওই যে স্বপ্ন দু'জন—ওরা দু'রকম। এদের কথা যদি আমি প্রকাশ করতে চাই, যদি আমার মনের ঠিক অবস্থাটার কাছে যেতে চাই, অন্তত যত দূর সম্ভব কাছে—তা হলে আমাকে তো এদের জন্য আলাদা আলাদা ভাষা খুঁজে আনতে হবে। আর যার কাছেই লুকিয়ে রাখি না কেন—নিজের কাছে তো লুকোতে পারব না যে, এই চারটি ক্ষেত্রে, আমার মনের জলবায়ু, মনের পৃথিবী চার রকমের হয়ে গিয়েছিল। আর সেই মনের পৃথিবীকে প্রকাশ করার জন্য ঠিক ভাষাটা কই? নেই। আমার কাছে নেই। এখনও পর্যন্ত নেই। আর সেটা অনুভব করতে পারলেই খারাপ লাগে। নিজের কাছে নিজেকে খারাপ লাগে। বাইরের কারণে নয়। নিজেরই অন্তরের কারণে। কারণ, কী লাভ লেখক-পরিচয় বহন করে যদি থেকে-থেকেই পরিবর্তনশীল এই মনটাকে, কবিতায় প্রকাশ করার উপযুক্ত ভাষাই না খুঁজে পাই? একটাই নাম ধরে যেমন দশজন আলাদা লোককে ডাকা যায় না, তাদের দশটা আলাদা নাম আছে, সেটাই তাদের পরিচয়, তেমন পাঁচটা আলাদা অনুভবকে একই ভাষায় প্রকাশ করা অন্যায়—অনুভূতিরা সকলে আলাদা। অন্যের নামে ডেকে তাদের অপমান করা যায় না। তখন মনে হয় ওদের আলাদা-আলাদা নাম আমি খুঁজে পাচ্ছি না আর। তখন, তখনই, নিজেকে খারাপ লাগে, নিজেরই অক্ষমতায়।

রোববারের ক্রমশ

অষ্টম গর্ভ

বাণী বসু

সপ্তম অধ্যায়

উদ্বোধন

এই সময়ের অব্যবহিত পর থেকেই নাকি বুবুর মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন আসে। সে অনেক বেশি দায়িত্বশীল, আত্মবিশ্বাসী এবং সবচেয়ে বড় কথা, বুদ্ধিমতী হয়ে উঠতে থাকে। ইন্দ্র ঋদ্ধি, এমনকী ভক্তিও বলতে থাকে মুক্তানন্দ ব্রহ্মচারীর ওই কিলটিই এর কারণ। মুষ্টিযোগ যাকে বলে! এ নিয়ে তিন ভাইবোনের একটা বিশদ উত্তেজিত আলোচনা সভা বসে। পম বলে মারধোর, চিমটে নিয়ে তাড়া, গালাগালি এ সবই মুক্ত পুরুষদের নানান লীলা, লোককল্যাণের জন্যে তাঁরা এই সব করে থাকেন, লোকে যাতে বুঝতে না পারে তার জন্যেও একটা কড়া ধরনের বাইরের চেহারা তাঁরা সযত্নে লালন করেন। না হলে তো লোকে ছেঁকে ধরবে। সেটা তাঁদের সাধনার পক্ষে ক্ষতিকর। দু-একজনের ওপর তাঁরা এমন কৃপা করেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামী, কাঠিয়া বাবা এরকম কত করেছেন! বুবু অতি সরল, উচ্চ ধরনের সোল তাই এ কৃপা পেল, হয় তো বুবুকে দিয়ে জগতের কোনও মহৎ কল্যাণ হবে।

বুবু সে দৃশ্যে উপস্থিত ছিল না। কিন্তু একটু দূরে তাকে দেখা যাচ্ছিল, পুনপুন আর সে দু'জনে মিলে একটা বই পড়ছিল। সেটা অবশ্য নীহাররঞ্জন গুপ্তর 'কালোভ্রমর', কিন্তু পম সে দিকে খেয়াল করল না, সে শিবনেত্রে তাকাল, প্রসন্ন নিশ্চিন্ত তার চাহনি, এতদিনে সে বুবুর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুশ্চিন্তামুক্ত হল।

ভক্তি বলল—বুবু অবশ্য বরাবরই বইয়ের পোকা। বুঝতে পারুক না পারুক পড়ে যায়।

ইন্দ্র বলল—আঁক কি কষতে পারছে? সেইটাই দেখতে হবে। চাউনিটা ভেড়ার মতো ছিল, ক'দিন দেখছি যেন একটা ঝিলিক দিচ্ছে। আস্তে আস্তে হবে।

এই প্রথম দুর্গাপ্রসাদ তাঁর পণ্ডিত ছেলেমেয়ের কথায় ক্ষুণ্ণ হলেন। তাঁর ছিল ডাক্তারি অভিমান। তিনি তো জানতেন আগাগোড়া তিনি কী চিকিৎসা করে যাচ্ছেন মেয়ের। সে একরকম উদ্বোধনের উজ্জীবনের চিকিৎসা। তার শরীরের মধ্যে থেকেই যাতে প্রাণশক্তি আসে, হঠিয়ে দেয় সব জড়তা, সব অপ্রাণ। তিনি যে শাস্ত্র মেনে চিকিৎসা করতেন, তার মূল নীতিই তো ছিল তাই। তিনি ষোল আনা জানতেন যৌবনোদগমের কাছাকাছি সময় থেকে মানবী শরীরে যে বৈপ্লবিক ওলোট-পালোট হয় তার পথ ধরেই আসবে নিরাময়। কাউকে বলতেন না, খালি স্ত্রীকে আশ্বাস দিতেন, ভেব না, সব ঠিক হয়ে যাবে। মনে মনে স্থির জানতেন বুবু সম্পূর্ণ সেরে যাবে, তাঁর সবচেয়ে



সফল কেস। কোনও অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস নয়, বিশ্বাস চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আর নিজের পারঙ্গমতায়। কাজেই মুক্তানন্দর কিল খেয়ে বুবু সেরে গেল এ কথা মেনে নিতে তাঁর যথেষ্ট বাধা ছিল। কিন্তু অত বিদ্বান, বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েরা বলছে, হঠাৎ আলটপকা কিলই বা গুরুদেব মারতে গেলেন কেন? ছোট মেয়ে, না হয় ঢুলেই পড়েছিল, তাকে ওই বিরাশি সিক্কার কিল? সুতরাং তিনি ফেলতেও পারছেন না, গিলতেও পারছেন না। নিজের কথা পাঁচজনকে বলার অভ্যাস তাঁর নেই। মস্তিষ্কে কুহেলি, হৃদয়ে অভিমান, তিনি স্ত্রীর সঙ্গেও এ নিয়ে কথা বলতে পারলেন না। গুরুঠাকুর দু'জনের মধ্যে দেওয়াল তুলে দিয়েছেন।

সুতরাং দেবহূতি কোল্যাপস করার ফলে গুরুপর্ব কোল্যাপস করে গেল এ কথা ভাবার কোনও কারণ নেই। সকাল সন্ধ্যার সাধন চলতে লাগল, এবং একটু রাত্তির করে ভজন। গান তো সিংহবাড়িতে হতই। দুর্গাপ্রসাদ গাইতেন, তাঁর সেজমেয়ে শ্রদ্ধা গাইত। ছোটদের নিয়ে শ্রদ্ধা গান শেখাতে বসত। তখন তো রীতিমতো বৃন্দগান। শ্রদ্ধা চলে যাওয়ার পরে গানের বাজারে একটু মন্দা পড়েছিল, কিন্তু দুর্গাপ্রসাদ মাঝেমাঝেই গেয়ে উঠতেন—'মহাকালের কোলে এসে গৌরী হল মহাকালী', কিংবা 'হরি হে তুমি আমার আপন হবে কবে', গাইতেন খুব দরদ দিয়ে। ইতিমধ্যে পুনপুন দিব্যি গায়ক হয়ে উঠেছিল। টেবিল বাজিয়ে সে নিখুঁত তালে লয়ে গাইত—রানার ছুটেছে তাই ঝুমঝুম ঘণ্টা বাজছে রাতে কিংবা পালকি চলে রে, অঙ্গ দোলে রে। কিন্তু এই মুক্তানন্দ ব্রহ্মচারীর আমদানি করা ভজনগুলো বুবু পুনপুনদের মনে প্রবল ভয় জাগাত। অঙ্কা তারে বঙ্কা তারে, তারে সুজন কসাই যেই শুরু হত অমনি তাদের প্রাণ কাঁপতো। দু'জনে দু'জনের দিকে আড়ে আড়ে তাকাত, চোখে বাঘের তাড়া খাওয়া গরুর চাউনি। অন্ধকার একটা গর্তর ভেতর ঢুকিয়ে দিত তাদের ওই গানটা। অঙ্কা আর বঙ্কা নামের দুই লম্বা দৈত্য ভাঁটার মতো চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকত, একটু একটু করে পুড়ে যেতে থাকত তাদের পাখনা, তাদের পালক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নখবিন্দু, কেশর, তাদের যা কিছু সম্বল ছিল সব। শ্রী গুরুরূপ উচ্চারিত হলেই বিভীষিকামূর্তি হয়ে যেতেন সৌম্যমূর্তি মুক্তানন্দ, প্রকাণ্ড একটা মুগুর ধেয়ে আসত তাদের মাথা, শিরদাঁড়া লক্ষ্য করে, চুরমার হয়ে যেত দু'জনে। তাই ভজনের সময়টা তারা দূরে চলে যেত,



যথাসম্ভব দূরে, ভজন থেকে, বাবা, দাদা দিদিদের থেকে দূরে। কোনওদিন কলঘরে, কোনওদিন ভাঁড়ার ঘরে পিসিমার বিরক্তি উৎপাদন করে, সবচেয়ে দূরে চলে যাওয়া হল পাশের বাড়ি। সেখানেও কি রক্ষা আছে! একদিন টুকু, লিলি, হিরন্ময়, খোকন ইত্যাদি তাদের বন্ধুদের দিদা বললেন—আহা! তোমাদের বাড়িটি যেন এই সময়ে স্বর্গ হয়ে ওঠে। তোমার বাবার গলা কী! তেমনি দোহার তোমাদের দাদা-দিদিরা। বুবু তুমি গাইতে পারো না?

—আমি পারি না, পুনপুন পারে।

—পুনপুন আহা একটা শোনাও না বাবা!

অনেক সাধাসাধি (সব লোক দেখানো, পুনপুন গাইতে বললে একপায়ে খাড়া)-র পর পুনপুন গান ধরল—

বাসরের দীপ আর আকাশের তারাগুলি

নিবিড় নিশীথে যবে জ্বলবে

তৃতীয় চতুর্থ লাইন নাগাদ সবাই মুগ্ধ হয়ে আছে, হঠাৎ দিদা রূঢ় গলায় বললেন—থাক পুনু আর গাইতে হবে না। তিনি উঠে চলেই গেলেন।

কী অপরাধে দণ্ড, ভাল বুঝতে পারিনি। আমরাও না, টুকুখোকনরাও না। বাড়িতে ফিরতে ফিরতে পুনপুনকে বলেছিলুম—এবার কেউ গাইতে বললে 'তুমি নির্মল করো'টা গাইবি, হ্যাঁ?

—দূর ও গানটা টানা, কোনও কাজ নেই কিছু নেই, ভাল্লাগে না।

—তা হলে 'পালকি চলে'?

—পালকি চলেতে টেবিল লাগবে, টেবিল বাজিয়ে একদিন স্কুলে গাইছিলুম, সার বললেন 'ডেঁপো...

অ্যাডাল্ট প্রেমের গান, সেখানে আমরা শুনছি সুরের ওঠাপড়া, কম্পন, ঝংকার। বড়রা দরদ দিয়ে ঈশ্বরকে ডাকছেন, আমরা দেখছি অন্ধ গহ্বর দৈত্য-দানো, বিচ্ছেদ, বহিষ্কার।

মাঝখান থেকে ভজনটা আর আমাদের কাছে গানপদবাচ্য রইল না। ডি ভি পালুস্করের গান বাজছে রেডিওতে-পায়োজি ম্যয় নে রামরতন ধন পায়ো, দাদাভাই মাথাটাথা নেড়ে বললেন—আহা, আহা, বড় ভাল গেয়েছে ভজনটা।

পুনপুন চিল চেঁচিয়ে উঠল—ভজন তো নয়, ওটা তো গান!

অষ্টম অধ্যায়
ইন দা উইল্ডারনেস

গুরুপর্ব আমাদের বড্ড গুরুপাক হয়ে গিয়েছিল সত্যিই। বুবুর কাছে যদি আতঙ্ক তো আমার কাছে হাহাকার। কিলটা বুবুর পিঠে পড়ে ওকে ভয়ের একটা ফোকাস দিয়েছিল, কিন্তু আমারটা ক্রমশ উপবৃত্তের আকার নেয়, তার যে কত ফোকাস, চারদিক থেকে যে কত হাহাকার ওঠে! কোথায় আদরঅলা শাসন, আর শাসনগর্ভ আদর? সেইসব দাদাদিদিরা আমাদের আর চেনে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাওয়া করেই যাচ্ছি, করেই যাচ্ছি, কেউ একবার বলে না পাবন বিদ্যা ওঠ, আমি করছি। আমরা আসলে সেবা করছি, মহাপুরুষের মহাসেবার মহাপুণ্য থেকে কেউ আমাদের বঞ্চিত করতে চায় না। পুণ্যটি যতক্ষণ পারুলদি আমাদের হাত থেকে কেড়ে না নিচ্ছেন যম-যন্ত্রণা অতএব। তারচেয়েও বেশি বোধহয় বিরহযন্ত্রণা রে বুবু, ওই সু-দাদা চলে গেল, আমাদের দিকে তাকাল না তো! টমদিদি প্রণাম করছে ঠাকুরকে, পাশেই যে আমরা দু-দিককে দুই কলগাছ বসে আছি, খেয়ালই নেই, সেই সু-দাদা যার কড়ে আঙুল ধরে দ্বারিকের কচুরি কিনতে যেতুম আর চুপি চুপি জিলিপি খেতুম, সেই টম যার তত্ত্বাবধানে ছাদের ফুলগাছে জল দিয়েছি ভোরবেলা, ঝুড়ি করে ঢেকে দিয়েছি সপ্তমুখী জবার গাছ। লেখাপড়া? তাও তো ডকে উঠেছে। বুবুর পড়াশোনার বালাই ছিল না, আমার তো ছিল! হোমটাস্ক করতে হবে, পড়া স্কুলে কী হয়ে যাচ্ছে জানি না। দু-একদিন স্কুলে যাওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু রান্না হয়নি কিছুই, না খেয়ে আর কী করে যাই দিনের পর দিন! কেউ যেতে উৎসাহও দেয় না। যেন বাড়িটার জীবনযাত্রাই বদলে গেছে।

গুরুদেবের কমলালেবু চাদরে ভর দিয়ে আমরা সব উড়ে গিয়ে পড়ব অন্য দেশে, অন্য উদ্দেশ্যে, সে দেশে পড়াশোনা নেই খুব ভাল কথা, কিন্তু খাওয়া-দাওয়াও নেই। শাসন চোখ রাঙানি নেই, কিন্তু মনোযোগও নেই কারও, যেন আমরা কয়েকটা ফালতু। আছি কি নেই বুঝতে পারছি না। বিকেলবেলা এক একদিন একছুটে চলে যাই বুনবুনের কাছে। সারেদের কাছে তো এরপর কষে কানমলা আর গাঁট্টা খাবো, তাই পড়া দেখে নিই। দিদিভাই খুব আদরের সুরে বলেন—পুনপুন, এখানে এসে ক'দিন থাক না। থাকবি? এখান থেকেই স্কুলে যাবি বেশ!

কী করে থাকি! মাকে ছেড়ে? মার যে কেউ নেই আমি আর বুবু ছাড়া! মুখ নিচু করে মাথা নাড়ি। দিদিভাই বলেন—স্কুলে যাচ্ছিস না, শাস্তি খাবি না?

—বাবা চিঠি দিয়ে দেবেন।

—পরীক্ষায় ফেল করলে?

এই ভয়াবহ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই।

মা নয়, পিসিমা নয়, এমনকী বাবাও নয়, পমদিদিই যে এইসব সিদ্ধান্তের কর্ত্রী, কেমন করে সেটা বুঝে যাই। তাছাড়া পমদিদিই পড়াশোনার ব্যাপারে সবচেয়ে সাবধানী, তাই খুঁজে পেতে পমদিদিকে একা একা পাকড়াও করি।

—পমদিদি, আজও স্কুলে যাব না?

—আর ক'দিন পরেই যাবে। কেন ভাল লাগছে না? কেমন সুন্দর উৎসব হচ্ছে বাড়িতে, কেমন নতুন নতুন সব।

আমি বলি—হ্যাঁ অ্যা, বিয়ের উৎসবটা খুব ভাল ছিল, কত মজা হল।

পমদিদির মুখ যেন কেমন হয়ে যায়, বলেই বুঝেছি বেফাঁস বলেছি, কিন্তু কী করে আর বলা কথা ফেরাই বা শোধরাই? একবার ভাবলুম বলি এ উৎসবটাও ভাল, কিন্তু মিথ্যে কথা বলতে না শিখিয়ে মা একটা মহা ক্ষতি করে দিয়েছেন, কিছুতেই বলতে পারলুম না।

পমদিদি এবার উদাস দৃষ্টিতে কোনও সুদূরে তাকায়, এই দৃষ্টিটা আমরা চিনি, এটাকে বলি 'কোন সে সুদূর অশোক কাননে বন্দিনী তুমি সীতা' দৃষ্টি, সংক্ষেপে 'কোন সে সুদূর' কিংবা 'বন্দিনী সীতা'। এ সব আমার আর বুবুর মধ্যে হয়, বদমাইশি নয় কিন্তু, খুব ভাবের ঘোরেই আমরা বলি এগুলো, এ গুলোর সঙ্গে মিশে থাকে আমাদের অবজার্ভেশন, এবং মুগ্ধতা।

—আচ্ছা পাবন, পমদিদি বলে, বলো তো জীবনের উদ্দেশ্য কী?

আমি গড়গড়িয়ে বলতে থাকি-পড়াশোনা করে, অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য সব ভাল্লো করে শিখে, ফার্স্ট হয়ে, প্রাইজ পেয়ে...

করুণ হাসি খেলে যায় পমদিদির মুখে, বলে—না পাবন, জীবনের আসল উদ্দেশ্য ভগবান লাভ করা। আচ্ছা, কাকে তুমি সবচেয়ে ভালবাসো?

দ্বিধাহীন গলায় আমি বলি—মা।

—খুব ভাল, ঠিক অমনি করে ভালবাসতে হবে ভগবানকে, তবে তিনি ধরা দেবেন।

আমি চুপ। মাকে ছেড়ে এমন কাউকে ভালবাসতে হবে যাঁকে চিনি না, জানি না, যাঁর সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই?

—ভগবানকে নিজে নিজে পাওয়া খুব শক্ত কাজ পাবন, তাই যাঁরা তাঁর কাছে পৌঁছেছেন তাঁদের ধরতে হয়, ভক্তি করতে হয়, সেই মানুষ হলেন আমাদের গুরুদেব।

উনি তা হলে ভগবান নন? ভগবানের কাছের মানুষ? আহ্, আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

—আর একটা জিনিস আছে—কৃপা। পমদিদি তখন বলছে—যদি তিনি তোমার ওপর কৃপা করেন তা হলে তুমি



সাধন ভজন না করলেও হয় তো এক লাফে ভগবানের কাছে পৌঁছে গেলে।

কী করে বোঝাই আমি ভগবানের কাছে মোটেই পৌঁছতে চাই না। তার চেয়ে ইস্কুলে হেডমাস্টারমশাইয়ের ঘরে ডাস্টার নিতে যাওয়াও ভাল।

বুবুতে আমাতে এ বিষয়ে গভীর আলোচনা হয়। কোনও জ্ঞানই আমি একা হজম করতে পারি না।

আমি—জীবনের উদ্দেশ্য কী জানিস?

বুবু—তার মানে?

আমি—মানে জীবনে কী হলে তুই সবচেয়ে খুশি হোস?

বুবু—এর আবার বলার কী আছে? একটা মস্ত বাড়ি হবে, অনেক উঠোন, দালান, বাগান, চোরকুঠুরি, যেখানে খুব ভাল লুকোচুরি আর চোরপুলিশ খেলা যায়, আর একশো তেরোটা চোদ্দটা ঘর থাকবে, সবগুলোর সঙ্গে কলঘর থাকবে, দালান পেরিয়ে কাউকে কলে যেতে হবে না, আর ঘরগুলোতে ঠাকুরদা, ঠাকুমা, বাবা-মা পিসিমা, দাদা-দিদিরা, দিদিভাই, দাদাভাই, মামুফুল, বড়মামা, মাইমা, বুনবুন আর জামাইবাবু থাকবেন। সবাই একসঙ্গে থাকব বেশ।

আমি—কিন্তু ঠাকুরদা ঠাকুমা তো মারা গেছেন!

বুবু—তাতে কী হয়েছে? আবার বেঁচে উঠবেন, তা হলেই আমি সবচেয়ে খুশি হব।

আমি—এ তো আর হয় না!

—তা হলে কী হয়? বুবু আমাকে চ্যালেঞ্জ করে।

আমি ঢোঁক গিলে বলি—সাধন করতে হয়, তা হলে ভগবানকে পাওয়া যায়। গুরুদেব আমাদের ভগবানের কাছে নিয়ে যান। আর ভগবানকে পেলেই সব পাওয়া যায়।

—ভগবান বিশ্রী, ভগবান আমার চাই না, তোর ইচ্ছে হয় তুই নিগে যা।

—কিন্তু ভগবানকে পেলেই যে সব পাওয়া যাবে?

—স-ব? জামাকাপড়, খাস্তার কচুরি, রসমালাই, মালাইবরফ, ঠাকুরদা, ঠাকুমা, বুদ্ধি, অংক...সব?

—তাই তো বলছে।

—কে?

—পমদিদি।

বুবু বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল। পমদিদি অনেকদিন ধরে পুজো আচ্চা করে করে ভগবান বিষয়ে এক্সপার্ট। কিন্তু সম্প্রতি তার বিচক্ষণতায় আমাদের কিঞ্চিৎ সংশয় হয়েছে।

হঠাৎ বুবু বলল—পমদিদির কথা আলাদা, পমদিদির তো বিয়ে হয়ে গেছে।

যাব্বাবা, জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাওয়ার কী সম্পর্ক? বুবুটা কিসের পিঠে কী যে বলে?

ও কথা এড়িয়ে তাই ভিন্ন কোণ থেকে আমার কথা পেশ করি।

—আর একটা পথ আছে বুঝলি?

—কী?

—কৃপা। ভগবান যদি কৃপা করেন তা হলে...

-কৃপা আমার চাই না, বুবু ঝাঁঝিয়ে ওঠে, তোর দরকার থাকে তুই নিগে যা। আমাকে দিতে এলেও নেবো না।

এইমতো কথাবার্তা হওয়ার পরেও কিন্তু আমাদের সংশয় ও সংকটমোচন হয় না। ভগবান ব্যাপারখানা কী? বেশ ভারি রকমের ব্যাপার না হলে কি এতগুলো লোক শুধু শুধু ভগবান ভগবান করছে! কোথাও একটা ভালমতো পাওনা-গন্ডার ব্যাপার আছেই আছে। ছেটবেলা থেকে শুনছি সবাইকার মুখে, অথচ এখনও রহস্যটার সমাধান তো দূরের কথা আন্দাজই পাওয়া গেল না। বুবুর অসুখের সময়ে ত্রিশূল ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতুম, সরস্বতী পুজোর সময়ে পাশটাশের সমস্যা নিয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিই। ধনং দেহি, রূপং দেহি, বিদ্যাং দেহি, দ্বিষো জহি। দুর্গাপুজোর পুষ্পাঞ্জলি দিতেও এই মন্ত্রটাই তো বলি। ধন মানে টাকাপয়সা সবাই জানে। আমি বুঝতে পারি আমাদের আর একটু টাকা পয়সা হলে ভাল হয়, তো ধন বাবদে না হয় চাওয়া গেল। আর রূপ? আমার নিজের চেহারাখানা তো বিতিকিচ্ছিরি, মাথার পেছনে খাড়া খাড়া চুল, সরু সরু কালো কালো ঠ্যাং, খাকি প্যান্টের তলা থেকে বেরিয়ে থাকে, ছিঃ! এই রূপ যদি পালটে ফেলা যেত তা হলে তো চমৎকার হত। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমাকে সবাই চিনতে পারবে তো? বিদ্যা অবশ্যই চাই, যদিও ই-দাদাদের মোটামোটা বই দেখলে আমার একটু ভয় ভয়ই করে। কিন্তু সারেরা যখন বলেন অভ্যাস করো অভ্যাস করো, সব বুঝতে পারবে, তখন নিশ্চয় পারব। তা ছাড়া ক্রিকেট আর কাব এর সময়টুকু বিবেচনা করলে পড়াশোনা আমার ভালই লাগে। দ্বিষো জহিটা বুঝতে পারি না। না বুঝেই তো বেশ চলে যাচ্ছে।

কিন্তু এই ভগবান ব্যাপারখানা কী? ঠিক যেন সরস্বতী ঠাকুর অথচ সরস্বতী ঠাকুর নয়। মুক্তানন্দকে সবাই ঠাকুর বলে ডাকলেও তিনি যে ভগবান নয়, এ কথা তো পমদিদি স্পষ্ট বলে দিল। আচ্ছা, ভগবান কি আমাদের মতো ছেলে? এই সব নানা প্রশ্নে উত্তমখুস্তম হতে থাকি। এবং অবশেষে অনেক সাধ্য সাধনার পর বুবুকে পাকড়াও করে ছাদে গিয়ে বসি।

অন্ধকার ছাদ। এইখানে আমরা প্রার্থনা করব, ধ্যান করব। চোখ বুজিয়ে বলব হে ভগবান আমাদের দেখা দিয়ে তুমি বুঝিয়ে দাও তুমি কেমন। রোজ দু'জনে চুপিচুপি চলে যাই। দশ মিনিট, পনেরো মিনিট, আধঘণ্টা পর্যন্ত ক্রমে বসে ফেলতে পারি। ভগবান দেখা দেন না, তিনি কেমন বুঝিয়ে দ্যান না, কিন্তু কেমন ভাল লাগে। তারপর নীচে নেমে পড়াশোনা করতে গিয়ে ডুবে যাই একেবারে। পাঁচটা সাতটা অঙ্ক পরপর ঠিক হয়ে যায়। সব কেমন শান্ত, বুকের ভেতরটা কী সুন্দর ঠান্ডা জলে ডুব গেলে রয়েছে। কিন্তু বুবু একটি অদ্ভুত চীজ। একদিন আধঘণ্টার চেয়েও অনেক বেশিক্ষণ হয়ে গেছে, হঠাৎ বুবু ধড়মড় করে উঠে পড়ল—ওরে বাবা, এইবার ভগবান আসছে, আমার ভীষণ ভয় করছে, বলতে বলতে বুবু দুড়দাড় করে নীচে নেমে গেল, যে পুনপুনের নাকি সে রক্ষাকর্ত্রী, তাকে ভগবানের কাছে একদম একলা ফেলে।

গুরুপর্ব এইভাবে আমাদের ভগবৎজিজ্ঞাসু করে তোলে এবং দেখা যায় শেষ বিচারে আমরা ভূত আর ভগবান দু'জনকেই সমান ভয় পাই।

(ক্রমশ)

ছবি : ঈলীনা বণিক

প্রাচীনার নবীনবেলার কাহন

'আজ আমাদের ন্যাড়াপোড়া, কাল আমাদের দোল।' বাড়ির খিড়কি পুকুরের পাশটিতে, পিছনের বাগানে মাটির হাঁড়ির ওপর খড়িমাটি দিয়ে চোখমুখ এঁকে তৈরি হয়েছে ন্যাড়া। কেউ বা বলে বুড়ি। যাকে নাকি আজ পোড়ানো হবে। বাড়ির ছেলেরা, দারোয়ান, চাকরবাকর—সবাই মিলে জড়ো করেছে শুকনো পাতার রাশি। একটু পরে আগুন ধরানো হবে। পাতাগুলো প্রথমে ধিকিধিকি, তারপর দাউদাউ করে জ্বলবে। মাঝে মাঝে শিখা হবে এমন উঁচুটি যে, তার ফাঁক দিয়ে গাঢ় নীল আকাশে থালার মতো রুপোলি চাঁদটা ঢেকে যাবে। আর সবাই মিলে চেঁচাবে 'আজ আমাদের ন্যাড়াপোড়া, কাল আমাদের দোল। পূর্ণিমাতে চাঁদ উঠেছে, বলো হরিবোল।'

গান্ধীপিসিমা গল্প করে বলেছিল হোলিকা রাক্ষসীর কথা। বৃন্দাবনে এসে মহা উৎপাত করছিল হোলিকা। তারপর এক বসন্ত পূর্ণিমার আগে শ্রীকৃষ্ণ সেই রাক্ষসীকে মারলে। মেরে পুড়িয়ে দিলে তার দেহ। বৃন্দাবনের সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে। পরের দিন মহাধুমধাম করে হোলিকা-নিধন উৎসব হল। যুগ-যুগ ধরে চলতে-চলতে কবে যে সেই উৎসবের নাম হল হোলি, কেউ জানে না। তবে আজও বসন্ত পূর্ণিমার আগে, মিথ্যে-রাক্ষসী পুড়িয়ে, তবে হোলি খেলা হয়।

গান্ধীপিসিমা বলত,

—ভাগ্যিস চৈতন্যদেব ওইদিন জন্মেছিলেন, নইলে বাংলাদেশে দোলটা আর আসত কোত্থেকে?

'দোল' কেন যে নাম হল, বলেনি গান্ধীপিসিমা। জিগ্যেস করলে বলত,

—দোলনায় দুলত-টুলত বোধহয় রাধাকৃষ্ণ...

—সে তো ঝুলন, পিসি!

—জানি না বাবা, চল দেখি ন্যাড়াপোড়া কদ্দুর হল।

পিছনের বাগানে সবাই তৈরি। জানলায়, ছাদের ওপর বাড়ির মেয়েরা পাঁচিল ঘেঁষে নীচের দিকে তাকিয়ে।

লাগল আগুন। জ্বলল শুকনো পাতার রাশি। তারপর আস্তে আস্তে আগুন ছড়াল। বাঁশের মাথায় ঝোলানো চোখ-মুখ আঁকা গোল হাঁড়িকে ঘিরে। তারপর উঠতে লাগল আকাশের দিকে তাক করে। গোল হাঁড়ি ফেটে চৌচির। সবাই মিলে উল্লাস-চিৎকারে মত্ত। আগুন যেন গোল চাঁদটাকে ঘিরে ধরেছে—যদি চাঁদটাও ফেটে যায় আগুনের তাপে?

ছাদের পাঁচিল ঘেঁষে বাড়ির সবাই। মা, জেঠিমা, ঠাকুমা, দিদিরা। সবাই বুড়িপোড়া দেখছে। আগুনের আলোয় সবার গায়ের রং কেমন যেন সোনার বরণ! কেবল আমি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি আতঙ্কে। আগুন আর চাঁদ পরস্পরের থেকে কতদূরে—বোঝার চেষ্টা করি আপ্রাণ। আর ভয় যেন খামচে ধরেছে পেটের ভেতরটা। সারাটা তলপেট জুড়ে কেমন মরণকামড় যন্ত্রণা।

একসময় আগুন নিভে গেল। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ওপাশে চাঁদ



তখনও অক্ষত, নিটোল। একে একে সবাই নেমে গেল ছাদ থেকে। আমি কেবল দাঁড়িয়ে রইলাম পাঁচিল আঁকড়ে। আগুনের শিখা চাঁদের কাছেও গেল না, অথচ আমার আতঙ্ক পেটের কাছটায় কামড়ে ধরে রইল। এক সময়ে ধীরে ধীরে নেমে এলাম নীচে।

পরের দিন দোল। বাড়িসুদ্ধ সবাই দোল খেলবে দুপুর অবধি। ছোট ছেলে, মেয়ে, কর্তারা। বউরা পুজোর ঘর সেরে মাংস রাঁধবে গরম মশলা দিয়ে। আঁশ রান্নাঘরের চারপাশটা জুড়ে মাংসের গন্ধ ম-ম করে ছড়িয়ে পড়বে। খাবার পর সবাই যে যার ঘরে দীর্ঘ দিবানিদ্রা।

আমার জ্যাঠতুতো দিদি বলল, আবিরে নাকি ঘুমের বড়ি মেশানো থাকে। তাই দোলের দিন দুপুরবেলা চোখের পাতা অমন ভারী হয়ে আসে। অত ঘুম পায়।

সকালবেলা ঘুম ভাঙল যখন, পেটটা তখনও কামড়াচ্ছে। কোমর অবধি ব্যথা। একবার ভাবলাম মাকে বলি। তারপর মনে হল, পেট ব্যথা বললে যদি দোল খেলতে না দেয় মা। যাক বাবা, বলে কাজ নেই।

ঠাকুমা সকালবেলা বেলের পানা খায় পাথরের গেলাসে। গিয়ে দেখি দু'পায়ে আবির মেখে জলচৌকিতে বসে আছে। জিগ্যেস করলুম ফিসফিস করে,

—তোমার বেলের পানা শেষ হয়ে গিয়েছে?

ঠাকুমা বলল,

—আহা! খেয়ে ফেললাম যে...কেন, খাবি? করে দিতে বলি।

বললুম,

—না থাক।



—কেন রে? পেট পরিষ্কার হয়নি।

ঠাকুমা অমনই। সুযোগ পেয়েই বাহ্য-পেচ্ছাপ—এসব নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বকে যাবে। তাড়াতাড়ি বললুম,

—না ছাড়ো।

ঘরে এসে দেখি মা খাটের ওপর রং খেলার জামা রেখে দিয়েছে। পুরোটা ছোট হয়ে যাওয়া রং ওঠা ফ্রক। সিন্দুকে করে তুলে রেখে দিত মা।

তখনও তো স্টেনলেস স্টিলের বাসনওয়ালির বাড়ি বাড়ি আসার চল হয়নি। তাই ছোট হয়ে যাওয়া জামা, হয় জমা থাকত দোলের দিনের জন্য, নয় চলে যেত কাজের মেয়েদের বাড়িতে।

জামাটা পরলাম। নীচে হুল্লোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রথম ঘণ্টাখানেক আবির খেলা চলবে। তারপর ধীরে ধীরে রঙের বালতিতে রং গোলা হবে। পেতলের পিচকিরি দিয়ে কে কত টিপ করে কাকে ভেজাতে পারে, তার প্রতিযোগিতা চলবে। গত ক'দিন ধরেই বাসনের ঘর থেকে বালতি, পিচকিরি বার করে ভাল করে তেঁতুল দিয়ে মেজে পরিষ্কার করা হয়েছে।

পেটের ব্যথাটা বাড়ছে। আবির মাখাতে মাখাতে কে একজন যেন বলল,

—কী হয়েছে রে? শুকনো দেখাচ্ছে মুখটা...

বললাম,

—কই? না তো!

ততক্ষণে লাল রঙের ছোপ পড়তে শুরু করেছে রংচটা জামায়। এখান থেকে, ওখান থেকে পিচকিরি তাক করছে জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো দাদা-ভাইরা।

প্রথমে পিচকিরি, তারপর একসময় গোটা বালতি রং, কে যেন ঢেলে দিল মাথায়।

গোটা জামা ভিজে, গা ভিজে। লাল রঙের ধারা সারা গা বেয়ে। পেটের ব্যথাটা দপদপ করছে। হঠাৎ দেখি হাঁটু বেয়ে গড়িয়ে নামছে যে লাল রংটা, সেটা কোনও বালতি করে কেউ ঢালেনি আমার গায়ে। আমার শরীর যেন ভেতর থেকে একটা কল খুলে দিয়েছে। তাই দুই উরুর মাঝখানে কেমন যেন তিরতিরে যন্ত্রণা।

মা রান্নাঘরে মাংস রাঁধছিল। আমি প্রায় হিড়হিড় করে টেনে আনলাম ঘরে।

মা এসে দেখল, তারপর বলল,

—বুঝতে পারিসনি আগে?

আমি বললাম,

—কী?

—পেট, কোমর ব্যথা করেনি?

নীরবে মাথা নাড়লাম।

নীচে দোল খেলা শেষ। বন্ধ কলঘরের দরজায় একে একে ধাক্কা দিচ্ছে সকলে। হাঁক পাড়ছে,

—কতক্ষণ লাগছে?

আর মা, আমার শরীর থেকে লাল রং ধোয়াচ্ছে। একবার কেবল মুখ তুলে বলল,

—এই ক'দিন আর ছুটোপুটি করবে না। আর ঠাকুরঘরে যেও না ক'দিন।

বললাম,

—ওমা! সন্ধেবেলা আরতি হবে যে?

—বাইরে থেকে শুনো।

সন্ধেবেলা আবার সেই ন্যাড়ামাথা চাঁদটা উঠল। আর আমি বারান্দার রেলিং ধরে চুপ করে বসে বসে, নীচের নাটমন্দির থেকে ভেসে আসা, দোলের দিনের রাধাকৃষ্ণ'র গান শুনতে লাগলাম।

—শ্যাম অভিসারে চলে বিনোদিনী রাধা
নীল বসনে মুখ ঝাঁপিয়াছে আধা।

রো ব বা রে র মে গা

ক্ষমা করো হে প্রভু

রূপক সাহা

পোড়া দোকানের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে অক্ষত জিনিসগুলো গোছাতে থাকে জয়দেব। দোকানকে ঘিরে মনে পড়ে তার ছোটবেলার নানা স্মৃতি। হঠাৎ মোবাইলে ফোন আসে সুশোভনদার। মহাপ্রভুর মৃত্যুরহস্যের আর্টিকেলটা ছাপতে মানা করে।

৯

আলিপুরের ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে উপাসনা বাস স্ট্যান্ডের দিকে এগল। বেহালাগামী মিনিবাস চিড়িয়াখানার মাছঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। ও তাই মাছঘরের দিকে হাঁটতে লাগল। এই সময়টায় মিনিবাস ফাঁকা থাকে। মিনিট কুড়ি-পঁচিশের মধ্যেই চৌরাস্তায় পৌঁছে যাওয়া যায়। ওর কাকা অবশ্য বাসে আসা-যাওয়া পছন্দ করেন না। গাড়ি নিয়ে বেরতে বলেন। কিন্তু লাইব্রেরিতে এক-একদিন উপাসনার পাঁচ-ছ'ঘণ্টা সময় লেগে যায়। অতক্ষণ গাড়ি আটকে রাখার কোনও মানে হয় না। কাকিমা শপিং করতে বেরন। খুড়তুতো বোন রিমিতাকে স্কুল থেকে নিয়ে আসতে হয়। কাকার সঙ্গে তাই আপোশ করে নিয়েছে উপাসনা। গাড়ি করে লাইব্রেরিতে আসে, কিন্তু বাড়ি ফেরে বাসে।

বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে উপাসনা দেখল, ব্রততী দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও থাকে কসবার দিকে। রিসার্চ করছে বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে। মাঝে মাঝেই ওর সঙ্গে লাইব্রেরিতে দেখা হয়। কোনও কোনওদিন একসঙ্গে ক্যান্টিনে চা খেতে যায়। সমবয়সি বলে আলগা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে দু'জনের মধ্যে। প্রায় আধ ঘণ্টা আগে ব্রততী লাইব্রেরি থেকে বেরিয়েছে। এখনও বাস পায়নি? সামনে গিয়ে উপাসনা বলল, 'দাঁড়িয়ে আছ যে? বাস সার্ভিসে কোনও গণ্ডগোল হয়েছে নাকি?'

মুচকি হেসে ব্রততী বলল, 'না না। একজনের জন্য আমি ওয়েট করছি। আমাকে পিক আপ করবে।' উপাসনা ঠাট্টা করে বলল, 'কে গো সে? লাইব্রেরিতে যার জন্য মোবাইল সেটটা তোমাকে সাইলেন্ট মোডে রাখতে হয়, সে নাকি?'

'বাব্বা, তোমার চোখটা তো সাংঘাতিক।'

'চোখের আর দোষ কী বলো! কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করলে একদিন না একদিন তো চোখে পড়বেই। মিথ্যে বলব না, ভদ্রলোককে আমি দেখেছি। সেদিন তোমরা চিড়িয়াখানা থেকে বেরচ্ছিলে। রিসার্চারদের প্রেম করার সেফ জায়গা। তা, তোমার প্রেমকাহিনি এখন কোন স্টেজে আছে? স্টেজ টু না থ্রি-তে?'

'মানে? তোমার কথা বুঝতে পারছি না উপাসনা।'

'বুঝিয়ে দিচ্ছি। দেখাদেখি, ঘোরাঘুরি, বোঝাবুঝি...এই তিনটে হচ্ছে প্রেমের কম্পালসারি স্টেজ।'

'তোমার অভিজ্ঞতা আছে বলে মনে হচ্ছে।' বলেই নিজেকে সামলে নিল ব্রততী। তারপর বলল, 'ইস, কী বোকার মতো কথা বলছি আমি। তোমার অভিজ্ঞতা থাকবেই বা না কেন? তুমি সুন্দরী, বিদুষী, স্বচ্ছল পরিবারের মেয়ে। তোমার পিছনে ছেলেরা তো দৌড়বেই।'

'ফর ইয়োর ইনফরমেশন ব্রততী, আজ পর্যন্ত কোনও ছেলে আমার পিছনে দৌড়য়নি। বিলিভ মি। উল্টে, স্কুলে পড়ার সময় আমি একজনের পিছনে দৌড়েছিলাম। কিন্তু সে আমাকে এমন ধমক দিয়েছিল যে, তারপর থেকে কোনও ছেলেকে প্রেমিক বলে ভাবতেই আমার ভয়।'

শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল ব্রততী। বলল, 'কী বলে ধমক দিয়েছিল গো?'

উপাসনাও হাসতে হাসতে বলল, 'যা বলেছিল, তা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। বলেছিল, পাকা মেয়ে কোথাকার। আগে পড়াশোনাটা কমপ্লিট করো, তারপর আমার কাছে এসো। ব্যস, ওই কথা শোনার পর থেকে প্রেম করার ইচ্ছে আমার উবে গিয়েছে। আমি ঠিক করেছি, রিসার্চ শেষ করার পর প্রেম-ট্রেম নিয়ে ভাবব। গুরুজনের কথা শিরোধার্য, কী বলো?'

'ভেরি ইন্টারেস্টিং। আরেকদিন ডিটেলে শুনব। আমার এখন স্টেজ টু চলছে। ওই উল্টোদিকে উনি এসে গিয়েছেন। হর্ন দিচ্ছেন গাড়িতে বসে। আজ চলি। কাল আসছ?'

'অবশ্যই। তখন তোমার কাহিনিটা শুনব। বাই।'

রাস্তা পেরিয়ে ব্রততী চিড়িয়াখানার মেন গেটের দিকে চলে গেল। দূরে ব্রিজের ঢালে বেহালার মিনিবাস দেখে উপাসনাও এগিয়ে গেল। আজ বেলা প্রায় এগারোটার সময় ও লাইব্রেরিতে ঢুকেছে। টানা চার ঘণ্টা ধরে পুরনো বই ঘেঁটেছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে নিয়ে ও গবেষণা করছে। অপ্রকট হওয়ার অনেক আগে মহাপ্রভু নাকি বলে গিয়েছিলেন, পাঁচশো বছর পর তিনি ফের ফিরে আসবেন। যদি সত্যিই পুনর্জন্ম নিয়ে থাকেন, তা হলে তাঁর বয়স এখন হবে তেইশ বছর। উপাসনা পুনর্জন্ম নিয়ে পড়াশোনা করছে। সেইসঙ্গে খোঁজখবর করছে, সত্যিই মহাপ্রভু আবার জন্ম নিয়েছেন কি না। নিয়ে থাকলে কোথায় তিনি আছেন, কী করছেন, ফের তাঁকে অবতার হিসেবে দেখা যাবে কি না—পুরো বিষয়টা নিয়েই উপাসনা খুব ব্যস্ত।

বাসে উঠে লেডিস সিট ফাঁকা পেয়ে গেল উপাসনা। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা ও বাঁদিকে সিটের ওপর রাখল। পৌনে পাঁচটা বাজে। এখনও পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় বাকি আছে। বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে টিভিতে রান্নার প্রোগ্রাম হয়। তার আগে ওকে বাড়ি পৌঁছতেই হবে। টিভি দেখে দেখে রোজ রান্নার রেসিপি লিখে রাখে উপাসনা। বিশেষ করে নিরামিষ রান্নার। ছুটির দিন সেই রেসিপি অনুযায়ী, রান্না করে ও কাকা-কাকিমাকে



খাওয়ায়। টিভি দেখে রান্না শেখার এই অভ্যেসটা ওর হয়ে গিয়েছে নবদ্বীপে থাকার সময় থেকে। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই পেন আর ডায়েরি হাতে নিয়ে ও টিভির সামনে বসে পড়ত। ওর বয়সি মেয়েরা সাধারণত রান্না নিয়ে আগ্রহ দেখায় না। ওর বাবা তাই ওকে খুব উৎসাহ দিত। পোড়ামা তলায় মন্দিরের কাছে, ওদের বাড়ির সামনেই বাজার। রেসিপি অনুযায়ী, ওকে কাঁচা আনাজ আর মশলা জোগান দিতে, বাবা বারবার বাজারে দৌড়ত তখন।

নবদ্বীপে এখনও উপাসনার বাবা-মা আর এক বোন থাকে। বাবা নিশীথরঞ্জন রায় হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। ভাল পসার আছে ওই অঞ্চলে। নিশীথ ডাক্তারের চেম্বারে যাব বললে, রিকশাওয়ালারাও নবদ্বীপ স্টেশন থেকে সোজা উপাসনাদের বাড়িতে নিয়ে যায়। আরও একটা কারণে নবদ্বীপের মানুষ ওদের পরিবারটাকে চেনে। ওদের বাড়িতে গোবিন্দর মন্দির আছে। রাসপূর্ণিমার সময় প্রতিবার ওই মন্দিরে খুব ধুমধাম করে উৎসব হয়। বাংলায় এমএ করার জন্য উপাসনা বছর চারেক আগে কলকাতায় কাকার বাড়িতে চলে এসেছিল। পাস করার পর ও লেক গার্ডেন্সের একটা প্রাইভেট স্কুলে চাকরিও পায়। কিছুদিন চাকরি করার পর বুঝতে পারে, টিচারদের কূটকচালিতে ও টিকতে পারবে না। তাই চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে ও নবদ্বীপে ফিরে যায়। সেই সময়টায় ফের কিছুদিন ও রান্না নিয়ে মেতেছিল।

এই রান্না করে খাইয়েই, একজনকে তাক লাগাতে গিয়ে উপাসনা ওর গবেষণার সূত্র পেয়ে গিয়েছিল। যার নেশায় জীবনের অন্য সব দিকগুলো আপাতত সরিয়ে রেখেছে। সেই দিনটার কথা ওর এখনও মনে আছে। সেই রাসপূর্ণিমার দিনের কথা। রাস উৎসবে ওদের মন্দিরে পাঠ করার জন্য এসেছিলেন আচার্য সুধীর মিশ্র মহাশয়। বয়স প্রায় আশির কাছাকাছি। পণ্ডিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। নবদ্বীপে বৈষ্ণবদের ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টায় যাঁরা এখনও অগ্রণী, আচার্য তাঁদেরই একজন। বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতৃভূমির কাছে এখনও তিনি একটা টোল চালান। তাতে শ'দুয়েক ছাত্র পড়তে আসে। আচার্যর সেবা করার জন্য উপাসনা সেদিন নতুন ধরনের কয়েক পদ নিরামিষ রান্না করেছিল। তা খেয়ে বৃদ্ধ আচার্য খুব খুশি হয়েছিলেন। মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন। ভাগবত পাঠের পর দীর্ঘসময় উনি উপাসনার সঙ্গে মহাপ্রভু প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। সেই সময়ই তিনি বলেন, কিছু লক্ষণ দেখে তিনি নিশ্চিত, মহাপ্রভু পুনর্বার জন্ম নিয়েছেন। কিন্তু তিনি কোথায় রয়েছেন, কী করছেন, সে সম্পর্কে জানেন সারা ভূমণ্ডলের মাত্র তেরোজন পুণ্যাত্মা। তাঁদের মধ্যে একজন কলকাতার কালীঘাট অঞ্চলে থাকেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি নাকি করে গিয়েছেন মহাপ্রভুর এক শিষ্য, তাঁর লেখা প্রাচীন এক পুঁথিতে।

আচার্য সেদিন বলেছিলেন, 'মা, আমি এই পুঁথিটির কথা জানতে পারি, তেইশ বছর আগে। তার মানে যখন মহাপ্রভু ফের মর্তধামে ফিরে এসেছেন। তখন আমার বয়স সাতান্ন বছর। পুঁথির সত্যাসত্য জানার জন্য তখন আমি ওড়িশায় যাই। কিন্তু তাঁর সন্ধান পাইনি।'

বৈষ্ণব পরিবারের মেয়ে বলেই উপাসনা খুব কৌতূহলী হয়েছিল। আচার্যের কাছে জানতে চেয়েছিল, 'মাঝে আর কোনও খোঁজখবর নেননি?'

আচার্য বলেন, 'না। ওড়িশায় থাকাকালীন কোনও একটা চক্র আমাকে মৃত্যুর হুমকি দিয়েছিল। আসলে মহাপ্রভুর মৃত্যু নিয়ে তুমি তো জানই, একটা ধোঁয়াশা আছে। ওড়িয়া বৈষ্ণবরা অবশ্য তা মানতে চান না। কিন্তু ওই হুমকির পর আমি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম, ধোঁয়াশা আছে বলেই চক্রটি চায় না, কেউ মহাপ্রভুর অন্তর্ধান নিয়ে নতুন করে খোঁচাখুচি করুক।'

'কিন্তু পুনর্জন্মে কি আপনি বিশ্বাস করেন আচার্য?'

'কী বলছ মা, অবশ্যই করি। এই নবদ্বীপেই আমি এক বালককে প্রত্যক্ষ করেছিলাম, যে তার পূর্বজন্মের কথা বলতে পারত। তখন তোমার জন্ম হয়নি। তোমার বাবার হয়তো স্মরণ থাকতে পারে। সেই বালকটি পূর্বজন্মে পুরীর কাছাকাছি এক গ্রামে কোনও এক জমিদারপুত্র ছিল। বিলাসী, অত্যাচারী এবং কালাজ্বরে তার মৃত্যু হয়েছিল। বালকটিকে নিয়ে আমরা সেই গ্রামেও গিয়েছিলাম। সে তার মা, আত্মীয়পরিজন, বাড়ি—সবই চিনতে পেরেছিল। এমনকী, কোথায় কী ধনসম্পত্তি আছে, তাও জানিয়েছিল।'

'সে এখন কোথায় আছে আচার্য?'

'সংবাদপত্রে তাকে নিয়ে একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। সেই লেখাটি পড়ে আমেরিকা থেকে এক মহিলা মনোবিজ্ঞানী এই নবদ্বীপে চলে আসেন। বেশ কিছুদিন তাকে নিয়ে গবেষণা করেন। তারপর তাকে নিয়ে আমেরিকায় চলে যান। জানি না, এখন সে কেমন আছে।'

'আপনি কি বিশ্বাস করেন, মহাপ্রভু সত্যিই ফের ধরাধামে এসেছেন?'

'অবিশ্বাস করার তো কিছু নেই। যে পুঁথিটির কথা তোমাকে বলছিলাম, তাতে নাকি লেখা আছে, এ জন্মে মহাপ্রভু অন্য অবতার রূপে আসবেন। ভক্তিবাদ প্রচারের জন্য নয়। তুমি খোঁজ করো মা। জানার চেষ্টা করো। তোমার বয়স আছে, মেধা আছে। তুমি পারবে। আমার অসম্পূর্ণ কাজটা যদি করতে পারো, তা হলে আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারব। আমার যতটা সাধ্য, তোমাকে আমি সাহায্য করব।'

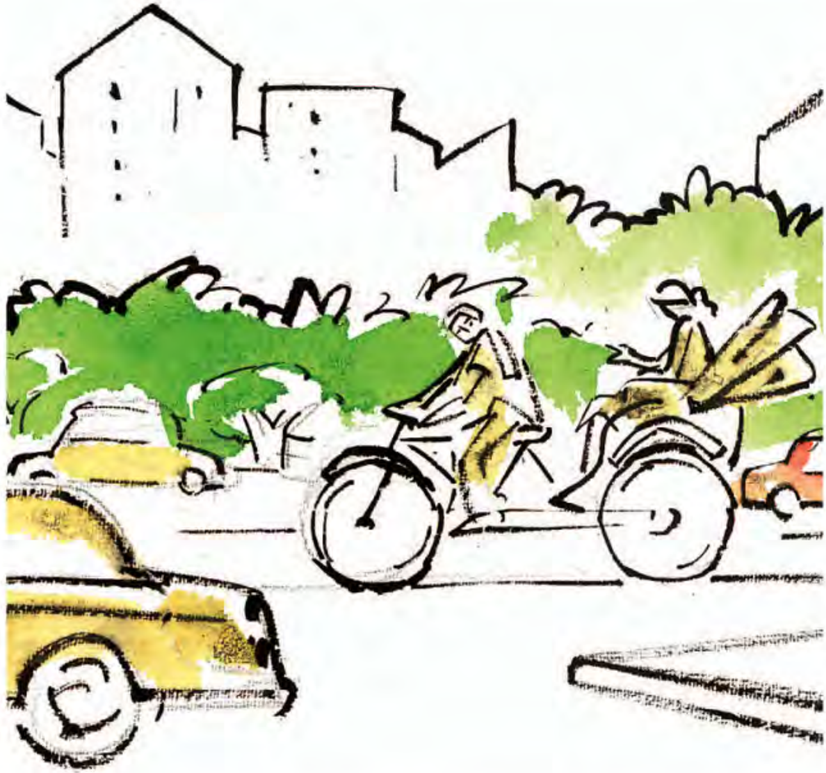
'আমি! আমি কি পারব আচার্য?'

'কেন নয়? আমেরিকা থেকে এক মহিলা এসে যদি পুনর্জন্ম নিয়ে গবেষণা করতে পারেন, তা হলে তুমি ওড়িশায় গিয়ে কেন সত্য উদ্‌ঘাটন করতে পারবে না মা? নতুন মহাপ্রভুকে আবিষ্কার করতে পারলে, বৈষ্ণব সমাজ তোমাকে মাথায় করে রাখবে।'

নবদ্বীপে কিছু উৎসাহী মানুষ চৈতন্য গবেষণা কেন্দ্র খুলেছেন। সেখানকার লাইব্রেরি থেকে বইপত্তর নিয়ে এসে, পড়াশোনা করে, বেশ আগ্রহ বোধ করেছিল উপাসনা। মায়াপুরে ইসকন মন্দিরের কর্তাদের সঙ্গে এই গবেষণা কেন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকদের নানা কারণে বিরোধ। তার মধ্যে একটা হল, শ্রীচৈতন্যর সঠিক জন্মস্থান নিয়ে। দিনকে দিন মন্দির কর্তারা টাকার জোরে তাদের সাম্রাজ্য বাড়িয়েই চলেছেন। সেটা লক্ষ করে, ঝামেলা এড়ানোর জন্য, মাস আটেক আগে উপাসনা কলকাতায় চলে আসে। তারপর থেকে ও রোজ ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যাওয়া শুরু করেছে। চৈতন্য গবেষকদের কাছেও যাচ্ছে। কেউই কিন্তু ওর গবেষণার বিষয়বস্তু, সিরিয়াসলি নেননি। এদিকে, আচার্য সুধীর মিশ্রর কথাও অবিশ্বাস করতে পারছে না উপাসনা। আচার্য বলেছিলেন, মহাপ্রভু যে আবার মর্তধামে ফিরে এসেছেন, তা জানেন কালীঘাটের এক পুণ্যাত্মা। কিন্তু তাঁকে উপাসনা খুঁজে পাবে কী করে? কালীঘাট মন্দিরে গিয়ে বেশ কিছুদিন ও খোঁজাখুঁজি করেছে। প্রায় সবাই ওকে পাগল ছাড়া আর কিছু ভাবেনি।

আচার্য বলেছিলেন, ওড়িশায় না গেলে ওর গবেষণা এক ইঞ্চিও এগবে না। উপাসনার এখন মনে হচ্ছে, উনি ঠিকই বলেছিলেন। পুরীতে দু'চারদিনের জন্য গেলে হবে না। ওখানে বেশ কিছুদিন মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে। পুরীতে ও যায়নি, তা নয়। কাকা-কাকিমাদের সঙ্গে একবার বেড়াতে গিয়েছিল। দিন সাতেক ওখানে ছিলও। ইস, তার আগে যদি আচার্যর সঙ্গে যোগাযোগ হত, তা হলে ওই সাতটা দিন ও পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারত। পুরীতে রোজই ওদের সঙ্গে দেখা হত শংকর পান্ডার। একেকদিন একেকটা মন্দির দেখানোর জন্য ওদের নিয়ে যেত। শংকর পান্ডার কথাবার্তা শুনে মনে হত, পুরীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। বিশেষ করে, জগন্নাথদেব সম্পর্কে। শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে ওকে জিগ্যেস করলে হয়তো ওর কাছ থেকে অনেক কিছু জানা যেতে পারে।

'ম্যানটন'। 'ম্যানটনে কেউ নামবেন?'



বাস কনডাক্টরের চেঁচামেচিতে উপাসনা বর্তমানে ফিরে এল। তাড়াহুড়ো করে ও বাস থেকে নেমে পড়ল। বাঁদিকের রাস্তা দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলে একটা পুকুর। তার উত্তরদিকে কাকার বাড়ি। অন্যদিন ও হেঁটেই বাড়ি পর্যন্ত যায়। আজ কী মনে হওয়ায় একটা সাইকেল রিকশায় চেপে বসল। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, পাঁচটা কুড়ি বাজে। সময়টা দেখে ও নিশ্চিন্ত হল, যাক টিভিতে রান্নার প্রোগ্রাম শুরু হতে এখনও দশ মিনিট বাকি আছে। বাড়ির সামনে এসে, রিকশাওয়ালাকে পয়সা দেওয়ার সময় হঠাৎ উপাসনা আবিষ্কার করল, কাঁধে ঝুলিয়ে রাখা ব্যাগটা নেই! গেল কোথায়? তখনই ওর মনে পড়ল, ব্যাগটা বাসেই রেখে এসেছে। ওই ব্যাগে সব খাতাপত্তর আছে। ওর গবেষণার যাবতীয় নোটস। কী হবে? চুলোয় যাক রান্নার প্রোগ্রাম। ব্যাগটা হারিয়ে গিয়েছে ভাবতেই উপাসনার কান্না পেয়ে গেল। ও তাড়াতাড়ি রিকশায় উঠে বলল, 'এই...আমাকে একটু চৌরাস্তার মোড়ে নিয়ে যাবে। ব্যাগটা বাসের সিটে ফেলে এসেছি। স্ট্যান্ডে গেলে হয়তো এখনও পাওয়া যেতে পারে।'

রিকশাওয়ালা বলল, 'ব্যাগে কি টাকাপয়সা ছিল দিদিমণি? তা'লে কিন্তু এতক্ষণে হাপিস হয়ে গ্যাচে।'

'না না। খুব বেশি ছিল না। ব্যাগে আমার খাতা আছে। ইম্পর্ট্যান্ট সব খাতা।' চড়তে দেবেন না। রিকশায় যেতে যেতে ও ভাবতে লাগল, রিসার্চের সব খাতা লাইব্রেরিতে নিয়ে যাওয়া ওর উচিত হয়নি। কাকা একটা ল্যাপটপ এনে দিয়েছেন। রোজই ও ভাবে, নোটসগুলো ল্যাপটপে তুলে রাখবে। আজ করব, কাল করব...ভেবে তুলে রাখা হয়নি। সেই গাফিলতির মাশুল হয়তো ওকে দিতে হবে। ফের কেঁচে গণ্ডূষ করতে হবে। কাগজপত্তরগুলো জেরক্স করে রাখলেও আজ ওকে আফসোস করতে হত না।

রিকশাওয়ালাটা বকবক করেই যাচ্ছে। তবুও, পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে ছেলেটা বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে দিল। পরপর তিনটে খালি বাস দাঁড়িয়ে আছে। কোন বাসটায় ও এসেছে, উপাসনা ঠিক চিনতে পারল না। গুমটিতে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে একজন বলল, 'দিদি, টু জিরো নাইন ফোর থেকে একটা লোককে, মেয়েদের সাইড ব্যাগ নিয়ে নামতে দেখেছি। লম্বা, পাঞ্জাবি পরা, সুন্দর মতো একটা লোক। এদিকেই কোথাও থাকে।'

উপাসনা ভেবেই পেল না, কে এই ভদ্রলোক? খালি বাস থেকে মেয়েদের একটা ব্যাগই বা তিনি কুড়িয়ে নেবেন, কোন উদ্দেশ্যে? তাঁর তো জমা দিয়ে যাওয়ার কথা গুমটিতে। না, বেহালা থানায় গিয়ে একটা ডায়েরি করে আসা উচিত। কথাটা মনে হওয়া মাত্র রিকশাওয়ালাকে উপাসনা বলল, 'চলো, একবার থানায় যেতে হবে।'

পরের এপিসোড আগামী রোববার
অলংকরণ শান্তনু দে

র‍্যান্ডম, যায়িচ্ছে, ভাবনা লোফালুফি

আমির খান বললেন, গান হিট করে গীতিকারের জন্য নয়, যে নায়ক বা নায়িকাকে নিয়ে গানের দৃশ্যটা তোলা হচ্ছে, তা(দে)র জন্য। বাক্যটির প্রথমাংশ একদম ঠিক, এবং পরবর্তী অংশ সাংঘাতিক উদো। কমিটি তৈরি হয়েছিল সিনেমার বিভিন্ন বিভাগের রয়্যালটি প্রদান নিয়ে আলোচনার জন্য, সেখানে বহু খ্যাত দিকপালের মধ্যে একজন আমির। তিনি বলেন, গান হিট করলে গীতিকারের কোনও বাহাদুরিই নেই, সে রয়্যালটি পাবে কেন? তর্ক বাধে জাভেদ আখতার-এর সঙ্গে। জাভেদ বলেন, গানের দৃশ্যের স্টারের জন্য সেই গানটা চলে? 'কেয়ামত সে কেয়ামত তক' ছবির 'পাপা কহতে হ্যায়' গানটা তা হলে হিট করেছিল কেন? ওটা তো তোমার প্রথম সিনেমা, তখন তো তুমি স্টার হওনি! অব্যর্থ যুক্তি। এরপর আমিরবাবুর গোসা হয়, 'কিছু লোক আমায় নিচু প্রতিপন্ন করতে চায়' বলে রেজিগনেশন জমা দেন, পরেরদিন থেকে 'আহা বাছা নাগ কয়ে না' মর্মে সব্বার উপরোধ জারি। সেসব ঠিক আছে, আমিরমশাই এখন বলিউডের চকচকে লকেট, নায়ক পরিচালক প্রযোজক হিসেবে তাঁর কীর্তি তুবড়ির ন্যায় উপচে পড়ছে, ইদানীং আবার মার্কেটিং-এর ম্যাজিকচরণ হিসেবে নাম কিনেছেন, কিছুর মধ্যে কিছু না ফল্‌স চুল পরে বেহালার রাস্তায় রাস্তায় সৌরভের বাড়ির ঠিকানা জিগ্যেস করে বেড়ান। হয়তো ক'দিন পর যথাযথ বলবেন, ছবি হিট করে পরিচালক বা চিত্রনাট্যকার বা অভিনেতা-অভিনেত্রীর জন্য নয়, শুধুমাত্র বিপণন-বিশারদের জন্য। আগে লোকে ভাবত সিনেমার গল্পটা কী, কারা করছে, কেমন ফোটোগ্রাফি, এর ওপর বোধহয় ছবির ভাগ্য নির্ভর করে। এখন দেখা যাচ্ছে ক'টা প্রিন্ট কোথায় ছাড়া হবে, তার হিসেব কষে ছবি সফল করা হয়, রিলিজের পর তিনদিন যেতে না-যেতে শোনা যায়, সিনেমা সর্বকালের হিট। বোঝো। আগে এর জন্য ছবি মাসছয়েক চলতে হত। এই বদলে যাওয়া জমানার বিভিন্ন প্যাঁচ-পয়জারের পাক্কুরাম আমির খান আরও কিছু বিষয়ে তাঁর সবজান্তা মন্তব্য ছড়াবেন, আশ্চর্য কী? তাই তিনি সগর্বে নিদান দিয়েছেন, গান হিট করায় কার কত ভূমিকা।

গান হিট করে কেন? উত্তর খুব সহজ। সুরের জন্য। আর, গায়কীর জন্য। একটা গোটা গানকে যদি একশো-র থালা ধরি, তবে তার সত্তর রান্না করেন সুরকার, আর তিরিশ নির্ভর করে গায়ক বা গায়িকা কেমন গেয়েছেন, তার ওপর। আর কিছু দরকার নেই। সুর যদি অপূর্ব হয়, আর সেটাকে ঠিকঠাক পরিবেশন করা যায়, ও-দৃশ্যে ল্যাম্পপোস্ট নাচালেও হিট হবে। লোকে গুনগুন করে ভাঁজবে, বারেবারে শুনবে। আমরা যখন এম-টিভি বা ভি-টিভিতে ইংরিজি গান শুনি, একটা কথাও বুঝতে পারি না। শুধু গানের নামটুকু যা লিখে দেয়, ওটুকু ছাড়া। তাতে কি ভাল সুর এসে হৃদয়ে কিছু কম লাগে? অমুক গানটা হলেই টিভি-র সামনে বসে যাই কেন? পুরোপুরি বিদেশি গানেও পার্টিতে নেচে ফাটিয়ে দিই। গানটা বকপাখি নিয়ে না হার্নিয়া নিয়ে তা-ও জানি না, তালটা ভাল্লাগছে, সুরটা দোলা দিচ্ছে, বাজনাটা ঝ্যামপ্যাক ঝ্যামপ্যাক করে জমাটি দিচ্ছে, ব্যস। রিকি মার্টিন স্প্যানিশ গেয়ে বাগুইহাটিতে হিট। স্বাভাবিক। সংগীত মানে হল সুর। শুধু একটা সুর ভাঁজলে লোকের মনে রাখতে অসুবিধে হবে, তাই কে কবে কতকগুলো শব্দ বসিয়ে দিয়েছে। সেই থেকে শব্দ বসানোর চল। তাতে বিরাট গুরুত্ব আরোপ করে আর গ্রাম্ভারি মুখে বসে বসে মাত্রা গোনে, এমন মানুষও কিছু আছে। কিন্তু প্রায়রিটি বুঝতেই হবে, আকুল হয়ে গণতন্ত্র রটালে শিল্প চলবে না। সবাই সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। সিনেমায় পরিচালকের ভূমিকা কস্টিউম-ডিজাইনারের চেয়ে বেশি। এ ক্ষমতা-বিন্যাস মেনে নিতেই হবে। গানে কথা-লেখকের ভূমিকা নাটকে চা-দিয়ে যাওয়া বেয়ারার মতো। ভাল অ্যাক্টিং করলে ভাল, না-করল তো বয়েই গেল, অন্য কেউ বিচ্ছিরি করে চা দিয়ে যাক না।

উচ্চমার্গের সংগীতের কথাটা একবার জাস্ট ভেবে দেখুন। হয়তো সারাদিন ধরে রাধার রা-টুকু গাইছে। সন্ধে নামলে ধা-য় পড়বে। সমঝদাররা তাই শুনছেন, এবং এটাই সংগীতের উচ্চাবস্থা, সকলেই মানছেন। হয়তো গোটা গানে দু'টো লাইন। লাইনগুলো খুব বিরাট কিছু বলছেও না। কাটে না বিরহের রাত। ব্যস। আশিবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এ-ই। বা খেয়ালের তরানা হচ্ছে 'তোম না তোম না দির দির তোম'। মানেই নেই। কিচ্ছু এসে যায় না। ধ্রুপদের আলাপ 'অনন্ত হরি নারায়ণ', শুধু এইটুকুকে ভেঙে ভেঙে চলেইছে, চলেইছে। আসল কথা হল স্বর-প্রয়োগ, ভাব তৈরি, ধ্বনিগুলোকে বারে বারে অবলম্বন করে করে সুর কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেমন করে বিস্তার ঘটছে। পুরো রসটা সেখান থেকে আসছে, কথার ভূমিকা এখানে শূন্য। শূন্য। ভগ্নাংশও নয়। এবার পশ্চিমে যান। মোৎজার্ট-এর, বেঠোফেন-এর, বাখ-এর অবিশ্বাস্য সৃষ্টিগুলোয় একটা বাণীও নেই। একটা বর্ণও না। শুধু সুর। শুধু বিভিন্ন যন্ত্র সেই সুরদের ধরে রাখছে, ছেড়ে দিচ্ছে, একটা বাঁশি একাপথে সুরটা নিয়ে আনমনে বেড়াচ্ছে, হঠাৎ তরঙ্গের মতো হইহই করে অসংখ্য বেহালা এসে যোগ দিচ্ছে, আবার নিজগাঁয়ে চলে যাচ্ছে। যেন একটা মিছিল চলেছে সুরের। যেন পৃথিবীর পাতাদের শিরশিরের মতো অহৈতুকী সুর পাহাড় জ্যোৎস্না বিষাদ জয়যাত্রা দেখে দেখে বেড়াচ্ছে। যাঁরা এ রসের স্বাদ নিতে জানেন, তাঁরা জনতোষিণী গানের বাণী ফানি হল না অভিমানী হল, সে প্রশ্নকে লবডঙ্কা দেখান। তাঁরা মধুতে চুবে থাকেন। তালমিছরির প্যাকেজিং নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা কীসের? এই ক্লাসিকাল ধাঁচাই বোঝায়, আসলি সংগীত কী জিনিস। শুধু সুর, শুধু সুরের ধারাস্রোত, শুধু সুরের আঁকবাঁক। এবার, তা থেকে ভেঙে, বেঁকিয়ে, চুরিয়ে সাধারণের উপযোগী সংগীত তৈরি করতে গিয়ে কথার সাহায্য নিতে হয়েছে, যাতে আম-শ্রোতার মনোযোগ ধরে রাখা যায়। আর, যাতে, কথা বসিয়ে দিলে সুরের উঁচু-নিচুগুলোকে সহজে মুখস্থ করে নেওয়া যায়। এই ক্রাচ, এই অ-প্রধান কিন্তু কিছুটা জরুরি অবস্থানওলা জিনিস, এই সহকারী ম্যাজিসিয়ান, এর জাত নিচু। এ প্রচলিত, জনপ্রিয়ও, কিন্তু ঠিকঠাক বনেদি দেউড়িতে এর পা পড়বে না।

এবার শুধু পপুলার গান নিয়েই ভাবি। বাংলা গানের যে-যুগকে এখন সবাই স্বর্ণযুগ স্বর্ণযুগ বলে লাফায়, তা কেন স্বর্ণযুগ? কারণ তখন গানের অসামান্য কিছু সুর দেওয়া হয়েছিল। আর, যাঁরা গাইতেন, তাঁদের কণ্ঠের এবং গায়কীর কোনও তুলনা ছিল না। তখন গানের কথা কেমন লেখা হত? তাই নিয়ে কেউই মাথা ঘামাত না, ঘামায়ও না। যদি কড়া নজরে দেখতে যান কথাগুলো কেমন, বুঝতে পারবেন, বেশ বাজে। ন্যাকা, তলতলে, পাতি। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। গানের কথাকে চিরকালই একজন ছোট বাচ্চার মতো দেখা হয়েছে। সে প্যান্ট পরলেও কিছু এসে যায় না, না-পরলেও। দুইয়েই তাকে সমান মিষ্টি দেখায়। যতক্ষণ না কামড়ে দিচ্ছে, ততক্ষণ সে পরমাদরের। গানটাকে মোটামুটি বহন করে নিয়ে যেতে পারলেই হল। এমন একশোটা মারকাটারি হিট গান আপনি এক্ষুনি মনে করতে পারবেন, বাংলা এবং হিন্দি, যেগুলোর সুর অপূর্ব, এবং কথা অতি-রদ্দি। সত্যি বলতে কী,



এমনও তত্ত্ব রচা যেতে পারে, হিট গান তৈরির ফর্মুলাই হল, দারুণ সুর আর বোদা কথা কম্বাইন করে দেওয়া। শুধু দিওয়ানা আর মস্তানা-র মিল আর কালে জুলফে গোরে গাল খেলিয়ে কতশত গান শচীনদেব বর্মণ থেকে অনু মালিক অবধি তরতরিয়ে বয়ে কিশোর রফি শানু শান-এর গলা ধরে পার পেয়ে গেল! 'ঝুম বরাবর ঝুম শরাবি ঝুম বরাবর ঝুম।' পরের লাইন কী? কেউ জানে না। কিন্তু হিট গান। 'মেহবুবা মেহবুবা মেহবুবা মেহবুবা উ-উ-উ' ছাড়া ওই গানে আর একটিও কথা না-থাকলে কী ক্ষতি হত? কিচ্ছু না। বরং কথা খুব ভাল হলে বিপদ, শ্রোতার তাঝিম-মাঝিম লাগতে থাকে। বোকা জনতার মাথা ঘোরে। উল্টো দিকে, আপনি ক'টা এমন হিট গান দেখাতে পারবেন, যেখানে সুর খারাপ আর কথা ভাল? বিচ্ছিরি সুর পেরিয়েও, শুধু কথার দৌলতে গানটি মুখে মুখে ফিরছে?! দুরন্ত একজন গীতিকার এসে অগা সুরকার ও অ্যাভারেজ গায়কের খামতি ঢেকে গানটিকে কাঁধে করে তরিয়ে দিয়েছেন? সম্ভবত একটাও না। বা, এই কয়েক লাখ হিট গানের রাজত্বে টিমটিমে তিনটে বা সাড়ে তিনটে। হিট-লিরিক আমাদের দেশে বহু আছে। কিন্তু হিট-সুর বিযুক্ত হিট লিরিক? হয়? অনেকে সার্থক গানে কথা ও সুরের যুগলবন্দির, সাযুজ্যের কথা বলেন। ভাল কথা ভাল সুর একসাথে গাঁথা, নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা। হাঃ। সলিল চৌধুরীর গানের পর গানে কথা-সুরের মেলবন্ধন তো ঘটেইনি, বরং তারা পুরো উল্টোবাগে হেঁটেছে। বিপ্লবের কথায় লাগানো হয়েছে প্রেমের সুর, অসহ দুঃখের কথা 'অন্তবিহীন কাটে না আর যেন বিরহের এই দিন, তুমি না আসিলে ভাল না বাসিলে সুরহীন তালহীন'-এর সুর শুনলে মনে হবে আনন্দের ফোয়ারা হুড়মুড়িয়ে বয়ে ভূভারত ধুয়ে যাচ্ছে। কিছু এসে গিয়েছে কি? গানগুলি অমর হয়ে আছে, থাকবে। সুরের জন্য।

তা হলে কি গীতিকারের একটুও অবদান একটা হিট গানের ক্ষেত্রে নেই? তা থাকবে না কেন? এই যে টিভি-তে সর্বক্ষণ চলছে 'দিল তো বচ্চা হ্যায় জি', বুড়ো শরীরের খাঁচায় জোয়ান হৃদয়ের ছটফটের সত্যি শুনে আমাদের চমক লাগছে না? 'শিং নেই তবু নাম তার সিংহ' মনে পড়ে আমাদের ভিড়বাসের মধ্যেও ফুরফুরে হাওয়া খ্যালে না? যে কোনও কিছুই বাজে হওয়ার চেয়ে ভাল হলে ভাল। বাজে গীতিকার একটা গান লেখার চেয়ে ভাল গীতিকার গানটা লিখলে, তা সুরের সঙ্গে আরও একটু ভাললাগা জুড়ে দেয়। জিনিসটা আরও গাঢ়, আরও মনকাড়া হয়ে ওঠে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে বোনাস। সুরের, গায়কীর গায়ে ছোট্টমোটু বিউটি স্পট। ধরা যাক, একজন ক্রিকেটার আছেন, যিনি দেখতে খুব সুন্দর। তিনি বাজে দেখতে (কিন্তু সমান দক্ষ) ক্রিকেটারদের তুলনায় মডেলিং-এর অফার পান বেশি, জনপ্রিয় হন বেশি, অটোগ্রাফ বিলোন বেশি। কিন্তু তাই বলে এমন থিয়োরি তো প্রণয়ন করা যাবে না, যে, ক্রিকেট ভাল খেলার একটি আবশ্যক শর্ত হল সুন্দর দেখতে হওয়া। ওগুলো বোনাস। ভাল দেখতে হওয়ার জন্য তিনি ওই বাড়তি জিনিসগুলো অর্জন করেন। কিন্তু আসল প্রতিভাটা ক্রিকেটীয়, সেটা আগে থাকতে হবে। আর, সেটা থাকলে, মুখের সৌন্দর্য না-থাকলেও, টেস্ট টিমে জায়গা কেউ আটকাতে পারবে না। তেমনই, একটা সুন্দর সুরের গান যদি সুলিখিত কথার অলংকার পরে শ্রোতার হৃদয়ের উৎসবে যায়, খুব ভাল, ধন্য ধন্য, বাহবা। অলংকার তার রূপকে বাড়িয়ে দেখাবে। কিন্তু তা বলে অলংকারটাই রূপ নয়। ওই অলংকার না-থাকলেও তাকে আদরযত্ন একই করা হত, হয়তো এক-আধটা প্রশংসাসূচক মন্তব্য কম পড়ত। সে আর এমন কী কম? গানের কথা হল তার দুল, লিপস্টিক, কোমরে একথোকা রুপোর চাবি। থাকলে ভাল, যেমন বাড়িতে ভাল কার্পেট থাকলে ভাল। কিংবা মিং বংশের ফুলদানি। তা না-থাকলে কি আমরা প্রিয়জনের বাড়ি গিয়ে মুখ ভেটকে বসে থাকি? গান আমাদের প্রিয় হয়, কাছে আসে, পাশে বসে তার সুরের কারণে। আর কিচ্ছু নয়। প্রেমিকার গা থেকে ভাল সেন্টের গন্ধ বেরলে ঘেঁষাঘেঁষি একটু বেশি নিবিড় হয়, এই যা। সেন্ট না-খুঁজে পেলেও বিরাট ঝঞ্ঝাট নেই, যেমন আছো তেমনি এসো। সাজ ও সত্তা-র মধ্যে গুলিয়ে ফেললে চলে?

আমির খান যা বলেছেন, সে-ও ওই বোনাসেরই ব্যাপার। যদি দুরন্ত তারকা একটি গানে খুব ভাল অভিনয়-টভিনয় করে লিপ দেন, তা গানটায় বাড়তি মাত্রা দেয়, গানটাকে আরও কিছুটা জনপ্রিয় করে তোলে, সোনায় সোহাগার গুঁড়ো ছড়ায়। কিন্তু একে তো, গানের দৃশ্যটা ভাল তোলা হল কি না, তা শুধু তারকার ওপর নির্ভর করে না। করে পরিচালকের ওপরেও, ক্যামেরাম্যানের ওপরেও। সবাই মিলে ওই দৃশ্যায়ন যদি খুব ভাল গড়ে তোলেন, তোফা। 'মেরে স্বপ্নো কি রানি' বা 'রূপ তেরা মস্তানা' শুনতেও যেমনি ভাল, দেখতেও। কিন্তু আসল ব্যাপার হল, অন্ধ লোকের কাছেও ওই গানগুলো হিট। 'ছোটি সি আশা'-র মতো একটা গান তৈরি করতে পারলে, অখ্যাত অভিনেত্রী মধু চান করলেও তা হিট। ও-গান ছবির শেষে নাম দেখানোর সময় চালালেও সুপারহিট হত। কালো পর্দায় সাদা নাম, আর লোকেরা সম্মোহিতের মতো শুনছে। 'আশিকি' সিনেমার সব গান পাগলের মতো হিট করেছিল। অভিনয় করেছিলেন কারা? রাহুল রায় আর অনু আগরওয়াল। তার আগেও তাঁদের নাম কেউ শোনেনি, পরেও না। কোন বুদ্ধির ঢেঁকি বলবেন, শানু আর নাদিম-শ্রাবণের জন্য নয়, রাহুল-অনুর জন্য গান হিট হয়েছিল? নিশ্চয়ই, মেগাস্টার থাকলে তাঁর গ্ল্যামার একটা ঘড়িকেও বেশি বিক্কিরি করে, একটা মশার ধূপকেও, একটা গানকেও। কিন্তু বিক্কিরিবাজির গর্ব আর ঔদ্ধত্য এসে যদি সহজ-বুদ্ধিকে তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, যদি নিজের ব্লগ-এ লেখা যায়, 'শাহরুখ আমার পা চাটছিল, আর হাত থেকে বিস্কুট খাচ্ছিল... শাহরুখ আমার পোষা কুকুরের নাম', আর গানের রয়্যালটি বিষয়েও শেষ কথাটি ম্যায় বোলুঙ্গা মর্মে হেঁকোর গজায়, তা হলে কোনদিন লোকে বলে বসবে, 'আমির হিট করে অভিনয়ের জন্য নয়, হামবড়া বিতর্কিত খান-পাটকেল ডায়লগবাজির জন্য!'



ব্র্যান্ডবাদশার নামরহস্য

এক যে ছিল কুকুর। তার নাম ছিল নিপার। কত না গপ্পো তাকে ঘিরে! ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল শহরের পথ থেকে তাকে তুলে আনেন মার্ক বারাউ। বাড়ির অতিথিদের নানাভাবে জ্বালাতন করতে ভারি ভালবাসত নিপার। তিন বছর পরে মার্ক মারা যাওয়ায়, তাঁর ভাই ফ্রান্সিসের সঙ্গে সে লিভারপুলে যায়। সঙ্গে যায় মার্কের গলার স্বরের বেশ কিছু রেকর্ড। তাঁর ফোনোগ্রাফ যন্ত্রটির প্রতি নিপারের আগ্রহ ছিল সীমাহীন। বিশেষ করে, যখনই এতে মার্কের রেকর্ড বাজানো হত, সে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ত। কোথা থেকে তার মৃত প্রভুর গলার স্বর ভেসে আসছে—সেটা বুঝতে, সে চুপ করে ফোনোগ্রাফটির সামনে দীর্ঘসময় বসে থাকত। এই দৃশ্যটি ফ্রান্সিসের মনে গভীর দাগ কাটে। নিপারের মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পরে, তিনি ক্যানভাসে ছবিটি আঁকেন। পরবর্তীকালে দুনিয়ার অন্যতম সেরা লোগো হিসেবে মেনে নেওয়া হয়।



কোম্পানির নাম 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস'। রেকর্ড, সিডি-র জগতের বাদশা। ১৮৯৯ সালে আঁকা এই ফক্স টেরিয়ার-এর ছবিটি ফ্রান্সিস রয়্যাল আকাডেমি-র এগজিবিশনে দেন। কিন্তু এটি বাতিল হয়ে যায়। ফ্রান্সিস এরপর ছবিটি এডিশন বেল কোম্পানিতে দেন। আবারও অমনোনীত হয়। তিনি এবার ওই ছবির একটা ফোটো নিয়ে হাজির হন গ্রামাফোন কোম্পানিতে। ম্যানেজার গ্যারি ওয়েন-এর ছবিটি পছন্দ হয়। তাঁর একটি শর্ত ছিল : ছবির পুরনো ফোনোগ্রাফটির জায়গায়, এমিল বার্লিনার-এর তৈরি করা গ্রামাফোনটি এঁকে দিতে হবে। ফ্রান্সিস শর্ত মেনে ১৮৯৯ সালের ১৭ অক্টোবর পরিমার্জিত ছবিটি কোম্পানিকে দেন। এর ঠিক পরের বছরই এমিল বার্লিনার লন্ডনে এসে ছবিটি দেখেন এবং কোম্পানির অফিশিয়াল ট্রেডমার্ক হিসেবে ছবিটি রেজিস্ট্রি করান। এই বছরেই গ্রামাফোন কোম্পানির বিজ্ঞাপনে প্রথম মুখ দেখায় নিপার নামের প্রভুভক্ত চারপেয়েটি। লোগোটির বয়েস একশো পেরিয়েছে আজ। ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে গ্রামাফোন কোম্পানির নাম হয়েছে 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস'। রেকর্ড বদলেছে ক্যাসেট-এ। ক্যাসেটের জায়গায় এসেছে সিডি। ভারতে এইচএমভি-র দোকান খোলে ১৯৪৬-এ। ১৯৮৫ সালে এর মালিকানা চলে যায় আরপিজি মিউজিকের হাতে। পরে এর নতুন নাম হয় 'সারেগামা ইন্ডিয়া লিমিটেড'।

২০০৩ সাল থেকে এদেশে আর এই লোগোটিকে দেখা যায় না বটে, তবু তামাম সংগীতপ্রেমী ভারতীয়ের নস্টালজিয়ায় কুকুরটি বারবার হানা দেয়। যার গান শোনা নিয়ে গান বেঁধে ফেলেন বাঙালি গানওয়ালা—'ছিল কলাম্বিয়ার বাঘের ছাপ্পা/কুকুর শোনে বাংলা টপ্পা, চোঙামুখে—

অদিতি বসুরায়


BOARD MEETING
SEAGRAM'S
IMPERIAL
BLUE
Superhits
Men will be men
O&M 559
Music CDs